অ ভি ষে ক

অভিষেক

শ্রীশান্তিময় ঘোষাল

কমলা বুক ডিপো
কলিকাতা

প্রকাশক :
সি. সি. ঘোষাল।

পরিবেশক :
কমলা বুক ডিপো।
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট :
ধীরেন বল।

মুদ্রাকর :
শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস।
শ্রীপতি প্রেস।
১৪, ডি এল্. রায় ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ :
আশ্বিন, ১৩৫৮।

দাম : এক টাকা বার আনা।

বাক্যের সহিত যেমন অর্থের সম্পর্ক, ছায়া'র সহিত যেমন কায়া'র, সাহিত্যের সহিত গণসমাজের সম্পর্কটাও যে প্রায় অনুরূপ এ-কথা অনস্বীকার্য্য! তবে "প্রায় অনুরূপ" বলিলাম এই জন্য যে বাক্যের অর্থ এবং কায়া'র ছায়া'র গতি একধা, তাহারা যথাক্রমে বাক্য এবং কায়া'র আশ্রিত; কিন্তু সাহিত্য ও সমাজ একে অন্যের অনুসৃত হইলেও তাহাদের গতির রীতি একধা নহে; এখানে আশ্রিত ও আশ্রেয় কে হইবে তাহা শুধু সাহিত্যের Standard-এর উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। সাহিত্য চলমান গণসমাজকে অনুসরণ করিয়া যখন রচিত হয়—তখন সাহিত্যই সমাজের আশ্রিত, কিন্তু সাহিত্যিক যদি নবধারার সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গণ-মানসে নূতন রং বুলাইয়া সমাজের চিরসিদ্ধ নীতিতে ফাটল ধরাইতে সিদ্ধকাম হ'ন তবে সেই সাহিত্যের সতেজ-ক্রান্তির নিকট সমাজই যে আশ্রিত হইয়া পড়ে ইহা ত' স্বতঃসিদ্ধ কথা। অবশ্য যে সাহিত্য সমাজকে অনুসরণ করিয়া রচিত অনেক সময় তাহাতে গতানুগতিকতা ও বৈচিত্র্য-হীনতা দেখা যায়, সমালোচকদের ক্ষুরধার লেখনীর আঁচড়ও তাহাদের বিরুদ্ধে রক্তমুখী হইয়া ওঠে না; কিন্তু নূতন ভাবধারা বা উন্নততর-ধারণা দিয়া, সে যত বড় সাহিত্যিকই কেন না হউক যখন প্রথম কোনও সাহিত্য বাহির করে তখন চারিদিকে "গেল" "গেল" চীৎকারের আতিশয্যও কম দেখা যায় না। যাহা হউক—গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত শান্তিময় ঘোষালের এই গ্রন্থখানা তাঁহার দ্বিতীয় উপন্যাস। ইঁহার প্রথম রচিত উপন্যাস পাথেয় পুঁথিতেই লেখকের অঙ্কুরিত প্রতিভা ও ভবিষ্যৎ শুভ সম্ভাবনার আভাষ আমরা পাইয়াছিলাম। কাজেই "অভিষেকে" বলিষ্ঠভাব, উন্নততর ভাষা প্রভৃতির সমাবেশ ঘটিয়াছে। সমাজে কতকগুলি ঘটনা অহরহই ঘটিতেছে যাহার সমর্থন সনাতনী রীতিতে পাওয়া যায় না—অথচ সমাজ বেশ মানিয়া চলিতেছে। অভিষেক একখানা বাস্তববাদী সাহিত্য; এবং সনাতনী

রীতির একটি মূর্ত্ত প্রতিবাদ স্বরূপ! কাজেই আপাততঃ অভিষেক কাহারও—কাহারও নাসিকা-কুঞ্চনের বস্তু হইলেও অচির-ভবিষ্যতে ইহা যে বাস্তবপন্থী বহুজনের সমর্থন ধ্বনিতে বন্দিত হইবে এই বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ! এই পুস্তকে লেখকও একস্থানে একটি ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণকে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে,—কোনও পুস্তক যদি বাস্তবতার অপরিপন্থী অথচ চিরাচরিত রীতি-নীতির বিরোধী কিন্তু উন্নততরা রীতি-নীতির—ধারক হয় তবে তাহাকে সমালোচনা-দণ্ডে ধূলিসাৎ না করিয়া দিয়া সমাজেরই উন্নীত হইয়া ওঠা কর্ত্তব্য। যাহা হউক অভিষেক সুধী-সমাজকে অভিষিক্ত করিতে পারিবে বলিয়াই আমরা আশা রাখি।

—প্রকাশক

বাবা ও মা'র

শ্রীচরণে—

আশ্বিন, ১৩৫৮।
৪০ বি, ব্রণফেল্ড রো,
কলিকাতা

‘আ-পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মণ্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্’—

এক

বাইরে আলো, ভেতরে অন্ধকার। প্রদীপ জ্বলে রয়েছে প্রাণপণে আলোর শিখাকে আঁকড়ে ধ'রে—তবু আলো একটুও ঘরে নেই। গভীর অন্ধকার চারদিকে জমাট বেঁধে আছে। দরজা-জানলা বন্ধ, খুলে দিলে হয়; কিন্তু প্রদীপ খুলতে রাজী নয়; অন্ধকার তার ভাল লাগ্‌ছে। তন্দ্রার আমেজ যায়নি তখনও। প্রদীপের শিখা দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলছে! নিভেও যেতে পারে; তাই ভয়! আলো-বাতাস আসতে দিচ্ছে না প্রদীপ ভেতরের অন্ধকারে। কিন্তু উপায় নেই; আলো ফাঁক খুঁজছে ভেতরে আসার, তার স্বভাব যে মৌসুমী বায়ুর মত; নিম্ন চাপ লেগেই আছে! পৃথিবীর যেখানে সূর্য্যের তাপে বাতাস উপরে উঠে যায়, সেখানে কি ফাঁক থাকে? একটুও থাকে না। পাশের বাতাস এসে দখল করে সেই শূন্য স্থানটা, আলোও তাই; সেও অন্ধকার দেখলে তাকে আলো দিয়ে মুছে দিতে চায়।

প্রদীপ সূর্য্যের আলোর কাছে হেরে গেল; বাইরের কড়া নাড়া তার তন্দ্রা ভেঙ্গে দিয়েছে অনেকক্ষণ। রাগ হয়েছে তার, তবে রাগটা বেশী নয়; এমন হেরে যাওয়া তার এই প্রথম নয়, তাই!

দরজা খুলে দিল প্রদীপ ; এক বোঝা আলোর সঙ্গে শিখা ঢুকে পড়ল ঘরে ; অন্ধকার লজ্জায় মুখ লুকোলো !

—প্রদীপ অন্ধকারে, এটা কি স্বাভাবিক ?—শিখা জবাব চাইল।

প্রদীপ জবাব দিল,—আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে অন্ততঃ এটাই স্বাভাবিক !

—সাহিত্যিকের কাছে বিজ্ঞানের উপমা শুনবো এটা তো আশা করিনি।

—ভুল করেছ, সাহিত্যিকেরাও যে বৈজ্ঞানিক ! বৈজ্ঞানিকের মতো তাকেও সল্‌ভ করতে হয়। তবে থিওরি নয় ; প্রবলেম অর্থাৎ সমস্যা !

—তা ঠিক ! হাঁ৷ সমস্যাই বটে। আমারও একটা সমস্যা আছে।

—তাই বুঝি এই অসময়।

—সমস্যা যখন ঘাড়ে চাপে, তখন সময় অসময় জ্ঞান থাকে না কারো। তা ছাড়া তোমার কাছে কোনটা যে সময়, আর কোনটা যে অসময়, তা আমার জানা নেই। আমার মনে হয়, যখন আসি তখন সময় ; আর যখন আসি না তখনই অসময়। যাক্ সমস্যাটা কথার ভীড়ে চাপা পড়ে যাচ্ছে। ওটার আগে সল্‌ভ করা হোক। কলেজে আজ ডিবেট্ আছে—'প্রকৃত যৌবন কি ?'

হাসি পেল প্রদীপের ; যৌবনের ব্যভিচার যখন অহরহ

চলছে, তখন আবার লোকে প্রকৃত যৌবনের সন্ধান করে? হয়তো করে, প্রদীপ তো সকলের খবর রাখে না। রাখাও সম্ভব নয়। কিন্তু রাখা উচিৎ; সাহিত্যিক,—সে সকল জাগতিক বস্তু সম্পদের ঊর্দ্ধে থেকে সকলকে বিচার করবে। জীবনের অন্ধকার, আলোর সমস্ত খবরই তো রাখবে। আলো আঁধারের সমস্যা যখন সাহিত্যের পট-ভূমিকায় দেখা দেবে তখন সাহিত্যিককেই তো সল্‌ভ করতে হবে সেই সমস্যার। প্রদীপ শিখার চিন্তার মধ্যে পথ করে নিয়ে এগিয়ে চল্‌ল তাদের খোঁজে, যারা প্রকৃত যৌবনের সন্ধান করেছিল, প্রদীপ দেখা পেল অনেকের; তাদের যৌবনকে ভাল ভাবে সল্‌ভ করে—নিজের ভাষার ছাঁচে ঢালতে লাগল।

শিখার বুঝি ধৈর্য্য-চ্যুতি হয়েছে, তাই প্রশ্ন করল আবার।

উত্তর দিল প্রদীপ,—জীবনের যে অংশ জগতের কল্যাণে লেগে সার্থক হয়; যে সুপ্ত উচ্ছ্বাস পর-হিতার্থে সময়ে কাজে লাগে, তাকে বলে যৌবন। এ যৌবনের দুটো দিক আছে; আমি যে দিকের কথা বলছি, সেদিকটাই প্রকৃত যৌবন। প্রকৃত যৌবন, বয়সের বিচার মানে না; অঙ্গ-মাধুরীর অপেক্ষা রাখে না; এর নির্দ্দিষ্ট কোন কাল নেই। যে যৌবনের জলে জগতের যাবতীয় আবর্জনা তরঙ্গে তরঙ্গে খেলে বেড়ায়; এ সে যৌবন নয়। এ যৌবন অখণ্ড আনন্দ-স্বরূপ, উন্মুক্ত ঔদার্য্য-স্বরূপ; এ সেই যৌবন—যে যৌবন নির্ভয়, যে যৌবন নির্ভুল-সুন্দর। এ যৌবনকে আমরা তোমরা চিনি না; কিন্তু চিন্‌তে

আকাঙ্খী; পেতে ইচ্ছুক। যথার্থ যৌবনের পরিচয় আর আমরা পাই না; ব্যভিচারে একেবারে ডুবিয়ে রেখেছি—এই সুন্দর-আনন্দ স্বরূপ প্রকৃত যৌবনকে। জন-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আজ এই প্রকৃত যৌবনের সন্ধান করা এই আধুনিক যুগে মিথ্যার পেছনে অন্ধ হয়ে ছোটা হবে। সন্ধান পাবে প্রকৃত যৌবনের ব্যভিচারের—তাই নয়?

সম্মোহনী শক্তিতে মোহিত শিখা নির্ব্বাক। প্রদীপের আলোয় তার যৌবন ভাল করে দেখে নিচ্ছে সে। এখুনি তো আবার পার্থিব যৌবন তরঙ্গে গা ভাসিয়ে দিতে হবে! মেকির সংস্পর্শে খাঁটিকেও সবাই তো মেকি বলে মনে করবে। খাঁটি সোনা চেনার জন্যে পাকা সেক্‌রা চাই আগে।

—শিখা তোমার সমস্যার সমাধান এবার হয়েছে আশা করি!

—হাঁ একটা সমস্যার সমাধান হ'ল।

—আরও সমস্যা ভীড় করে ঘিরে আছে নাকি?

—সমস্যা ঘিরে আছে সত্যি, তবে—বহু নয়—একটা।

—তার মানে?

—তার মানে, আর বেশী সমস্যা ঘাড়ে চাপ্‌তে পারেনি—এক সমস্যাই তো দেখ্‌তে পাচ্ছি, একটা বিরাট দৈত্যের মত। মেঘের মত, আকাশকে কালো করে রেখেছে। সূর্য্যের আলোকে ঢেকে ফেলেছে। একটুও ছেঁদা নেই আলো আসার। একটুখানি যদি ছেঁদা করে দিতে পার।

—সম্ভব হবে কি?

—তোমাদের কাছে অসম্ভব বলে কি কিছু আছে ? আমার মনে হয় তোমরা সব-ই করতে পার।

—তোমার মতের উপর তো সমস্ত কিছু নির্ভর করছে না।

—কেন করছে না প্রদীপ দা ! আমারই সমস্যা আমার উপর নির্ভর না করে অপরের উপর নির্ভর করবে কি করে ?

—তুমি কোন সমস্যার কথা বলছ, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না শিখা।

—বোঝা তোমার উচিত ছিল।

—তুমি কি আমার-তোমার সামাজিক মিলনের কথা বলছ ? অসামাজিক মিলন কি নতুন কোন সমস্যার সৃষ্টি করেছে ?

—না তা করেনি, কিন্তু তুমি তো জান—মা মারা যাবার সময়, আমি মার মাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, বাবার অমতে আমি জীবনে কোনদিন কোন ইচ্ছেই পূর্ণ করবো না।

—আচ্ছা শিখা, কাল সাহিত্য-বাসরে এসো ; আজ একটু চিন্তা করে কাল তোমায় এ সম্বন্ধে আমি পরিষ্কার করে সমস্তই বলব।

শিখা চলে গেল। যেমন করে এসেছিল ঠিক তেমন করে নয় ; সমুদ্রের ধারে সূর্য্যোদয় যেমন অদ্ভুত,—আধখানা অগ্নিকুণ্ড ধীরে ধীরে উপরে উঠছে—গতি খুবই মন্দ, হঠাৎ দেখা গেল একেবারে উপরে উঠে গেছে ; মাত্র কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে। শিখার আগমন কতকটা ওই রকমের ; কিন্তু গমন ছিল তার সূর্য্যাস্তের মত ক্লান্ত ধীর-পদে।

সূর্য্যাস্ত হয়েছে ; এতক্ষণ যে অন্ধকার প্রদীপের তলায় দানা বেঁধে ছিল, তা এখন উপরে এসে আবার আলোকে ঢেকে দিল।

প্রদীপ দরজা-জানলা আবার বন্ধ করে চিন্তার সমুদ্রে গা ভাসিয়ে দিল।

মনে হল শিখার সমস্যা প্রদীপের নিজের সমস্যা ; একে এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তার নেই।

…চিন্তার ঝড়ে মনের মেঘ বেশ খানিকটা উড়ে যাচ্ছে ; দুর্য্যোগ নাও হতে পারে ; আলো দেখা দিচ্ছে আবার।

প্রদীপ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

দুই

সাহিত্য-বাসরে যে প্রবন্ধটা পাঠ করে শোনাবার কথা ছিল প্রদীপের, তা শুরু হয়েছে অনেকক্ষণ, কিন্তু তেমন জমে উঠেনি। সাহিত্যের সঙ্গে মানব-মনের অন্তর্নিহিত ভাবধারার যে সুন্দর মিল আছে ; প্রদীপের প্রবন্ধ তার-ই বিশ্লেষণে রচিত। আদিম যুগে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ বল্কল পরেই যে সুন্দরে আকৃষ্ট হয়েছিল, আকাশের রামধনুর সৌন্দর্য্য নির্ব্বাক হয়ে উপভোগ করেছিল ; প্রদীপের প্রবন্ধ তারই উল্লেখ করে আমাদের মনের অন্তরতম দেশে যে সৌন্দর্য্যের উপাসক অনাদি কাল থেকেই বাসা বেঁধে আছে—সেই কথা প্রমাণ করতে চায়।

শিখা আসেনি এতক্ষণ ; এবার এসে বসেছে সামনের একটা ছোট চেয়ারে। রামধনু রঙ্গের শাড়ীটা শিখার দেহ-লতাকে বেষ্টন করে মেঝের কারপেটে উপুড় হয়ে পড়েছে। ফুলের পাশে ভ্রমর আসেনি একটাও। দূরে দাঁড়িয়ে মধুর আস্বাদন পেতে চেষ্টা করছে।—প্রদীপ শিখাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। সুযোগ দিয়েছে বিস্তারের ; উপরে উঠার। সাহিত্যেরও বিস্তার হয়েছে সাথে সাথে।—শিখাকে কেন্দ্র করে।

প্রবন্ধের বাকি অংশ আবার পড়ে চলেছে প্রদীপ, "এই সৌন্দর্য্য পিপাসাকে তৃপ্ত করার জন্যেই সাহিত্যের সৃষ্টি। সৌন্দর্য্য শুধু চোখে দেখার জিনিষ নয় ; অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হয়। সৌন্দর্য্য হীন সাহিত্য বর্ত্তমান দাবীকে পূর্ণ করলেও চিরকালের দাবীকে পূর্ণ করার ক্ষমতা তার নেই। এই সৌন্দর্য্য পিপাসু মনের বিশ্লেষণ করেছেন কালিদাস, সেক্সপীয়র, বাল্মীকি, রবীন্দ্রনাথ। শিল্পীর মায়া-মুকুরে ছায়া পড়ে বিশ্বমানবের, তাই সাহিত্যিকদের কোনও জাত নেই, নেই বয়স, নেই দেশ। তাঁদের পরিচয় তাঁরা শিল্পী। বাল্মীকি, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ এঁদের কি কোনও বিশেষ সীমানায় আবদ্ধ করা যায় ?

সাহিত্যের অনুভূতি, শিল্পের অনুভূতি ; চিরকালের প্রাণের অনুভূতি। জাতের তফাতে, সময়ের তফাতে, মানুষের হৃদয় কি কখনও আলাদা হয়ে যায় ? যায় না। একজন ভারতীয় মায়ের মাতৃত্বের সঙ্গে কি পার্থক্য আছে, একজন ইংরাজ রমণীর মাতৃত্বে ; আমাদের দেশের অত্যাচারিতের সঙ্গে কি কোনও পার্থক্য আছে

অন্য দেশের অত্যাচারিতের? মানুষের মৃত্যু আছে; কিন্তু মানব-মনের মৃত্যু নেই। সৌন্দর্য্য পিপাসু মানুষের মন অমর। তা যদি না হতো বহু শতাব্দী পূর্ব্বের সাহিত্যের কোনও মূল্য থাকতো না এই বিংশ শতাব্দীতে।— রামায়নী যুগে রামচন্দ্রের বিরহ বেদনা কি মানব মনে আজো দোলা দেয় না? মেঘদূতে যক্ষ-প্রিয়ার বিরহ বেদনা, অলকায় তার বিরহিনী-রূপ কি আজকের মানব-হৃদয়কে ব্যাথাতুর করে তোলে না? যক্ষের বিরহ কি শাশ্বত চিরন্তন বিরহ নয়? অ্যান্টনী, ক্লিও পেট্রার প্রেম কি চিরন্তন প্রেম নয়?"

হাঁ চিরন্তন; মানব-মনের অনুভূতি অমর। আদিম যুগের অমরাত্মার সঙ্গে এর বন্ধন অচ্ছেদ্য; তাইতো আজও সুন্দরের সৃষ্টি হয় সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে। বহু শতাব্দীর পূর্বের সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের তাইতো এতো মিল!

সাহিত্য—মনের অন্তর্নিহিত ভাবধারায়, শিল্পীর সৌন্দর্য্য সাধনায় সৃষ্টি!

প্রদীপের প্রবন্ধ সৌন্দর্য্য পিপাসুদের মনে রেখাপাত করেছে বলে মনে হল। শিখা মনে মনে আফশোষ করছিল, প্রথমে না আসার জন্যে।

মিঃ গাঙ্গুলী উঠে এসে প্রদীপকে কন্‌গ্রাচুলেসন্ দিয়ে বললেন,—সাহিত্য সৃষ্টি আপনার অমর হয়ে থাকবে প্রদীপবাবু।

—সাহিত্যের তো মৃত্যু নেই।

—তাত নেই-ই, তা ছাড়া ঐ সঙ্গে তার স্রষ্টাটিও অমর হ'য়ে থাকেন।

তা জানিনা, তবে এটুকু জানি যে সাহিত্য যেদিন আমাদের মনকে দোলা দিতে পারবে না, সেদিন হবে শুধু আমাদের মৃত্যু নয়, আমাদের জাতের অপমৃত্যু; সাহিত্য আমাদের জাতের মজ্জার সঙ্গে মিশে আছে যে।

—আচ্ছা প্রদীপবাবু বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে যে নতুন ভাবধারা আনার চিন্তা চল্‌ছে, তাকে কি আপনি সমর্থন করেন?

—ঠিক করি না, যারা নতুন ভাবধারা আনার জন্যে চেষ্টা করে চলেছে, তারাই ঠিক বলতে পারবে না এই আধুনিক ভাবধারার আসলরূপ কি? তবে আমার যতদূর মনে হয় এই নতুন ভাবধারা নিছক্‌ সাময়িক সাহিত্যে পরিণত হবে। চিরন্তন সাহিত্যে কখনও মর্চ্চে ধরে না; তা খাঁটি ইস্পাত দিয়েই তৈরি। তাকে নতুন করে গড়তে চেষ্টা করা মানে খাদ মেশান। খাঁটি ইস্পাতের নতুন যন্ত্র; পুরাণ লোহায় হলেও মজবুত হয়।

মিঃ গাঙ্গুলী যা বল্‌তে চেয়েছিলেন তা বলা হল না। আবার একদিন দেখা করবেন বলে তাঁর বক্তব্য তিনি শেষ করলেন।

প্রদীপ শিখাকে সঙ্গে নিয়ে ধনী ব্যবসায়ী মিঃ গাঙ্গুলীর বাড়ীর গাড়ী বারান্দা পেরিয়ে রাস্তায় নেমে এলো।

কিছু পথ এগিয়ে গিয়ে প্রদীপ-ই প্রথম মুখ খুল্‌ল—সমস্যা

কি এখনও আকাশটাকে তেমনই অন্ধকার করে রেখেছে। এতটুকুও আলো কি তোমার মনের আকাশে দেখা দিচ্ছে না?

—না।

—কিন্তু আমার দিচ্ছে।

—আশ্চর্য্য !

—আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে শিখা। তোমার সমস্যা কি আমার সমস্যা নয়! তোমার চিন্তাধারা কি আমাকে বাদ দিয়ে চলতে পারে? পারে না তো! গতকাল তুমি চলে যাওয়ার পর, আমি আবার অন্ধকারে ডুবে গেলুম। অন্ধকারে কিন্তু চিন্তা করা যায় ভাল। সমস্যার সল্‌ভ হয় তাড়াতাড়ি। নিরিবিলি একা একা থেকে নিজেকে চেনার সুযোগ ঘটে। শহরের কোলাহলে থেকে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেল্‌তে হয়। তাই যতক্ষণ পারি, ততক্ষণই অন্ধকারের রাজ্যে ডুবে থাকতে ইচ্ছে করে। এর আরও একটা কারণ আছে, অন্ধকারে থেকে বোঝা যায়; যে এত আলো থাক্‌তেও, এতখানা অন্ধকার প্রদীপের নিচেটায় লুকিয়ে ছিল কি করে। হ্যাঁ, আসল কথাটা বলি এবার—চিন্তার সমুদ্রে সাঁতার দিতে দিতে হঠাৎ একটু পাড়ের মাটী পায় লাগল। চিন্তা করা বন্ধ হয়ে গেল। ভাবলুম কুল এবার পেয়েছি!

—কি ঠিক করেছ?

—ঠিক করেছি যে তোমার বাবার কাছে গিয়ে তোমায় পাওয়ার প্রস্তাব করব!

—প্রস্তাবে রাজী হবেন বলেই মনে হয়; কিন্তু যদি না হন!

—আমার একান্ত প্রার্থনাও কি তিনি এড়িয়ে যাবেন?

শিখার গলাটা কেঁপে উঠল,—যদি এড়িয়ে যান!

—আমি ও চিন্তা তো করিনি। ওযে তোমার উপর নির্ভর করছে!

—ঠিক আমার উপরও নয়; নির্ভর করছে বাবারই উপর। তুমি তো জানো আমার অক্ষমতা কোথায়!

—জানি শিখা! কিন্তু অত চিন্তা করে কোন লাভ হবে না। তৃণখণ্ডকে আশ্রয় করে বাঁচার মত একবার শেষ চেষ্টা করব ঠিক করেছি!

রাস্তার মেয়াদ শেষ হয়ে গেল; শিখার বাড়ী কাছেই। প্রদীপ এবার চুপ করে গেছে।

শিখাই মৌন ভাঙলো এবার, বললে—আজ বিকেলে এসো; শীতের রোদ্দুরের মত তোমার প্রবন্ধটা দেহ মন দিয়ে ভোগ করেছি। বেশ ভাল লাগল আমার।

শিখা বাড়ী চলে গেল।

তিন

সূর্য্যকান্ত,—অয়সকান্ত নয়, সূর্য্যকান্ত। সমুদ্রে আলোক-স্তম্ভ। নক্ষত্রখচিত আকাশে ধ্রুবতারা। শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ পৃথিবীর ভৈরবী দীপ্ত-মূর্ত্তি। প্রদীপ এখানে ম্লান, বিশুষ্ক ধরণীতে শীর্ণ জাহ্নবীর মত ক্ষীণ দুর্ব্বল।

এই দীপ্ত সূর্য্যকান্ত আবার প্রশ্ন করলেন প্রদীপকে,—শিখার মঙ্গল অমঙ্গলের চিন্তা তোমার মনে ঢুকলো কেন বলতে পার?

প্রদীপ জবাব দিল,—এ অবাস্তব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার কোন অর্থ হয় না।

—তবে কি মনে কর তোমার বাস্তব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার অর্থ আছে।

—আমার মনে হয় আছে।

—তোমার মনে হওয়ার উপরই সমস্ত নির্ভর করে না, এটা তোমার জানা উচিত ছিল।

শিখার পিতা সূর্য্যকান্তের চোখে আবার জ্বলে উঠল রক্তিম বহ্নি-শিখা!

প্রদীপ প্রশ্ন করল এবার,—আমাদের বাধা দেওয়ার আগে একবার কি চিন্তা করেছিলেন আপনি; আপনি কি বিচার করে দেখেছিলেন—শিখা তার যোগ্য স্থান-ই বেছে নিয়েছে; শুধু বেছে নেওয়া নয়; তাকে আশ্রয় করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে; এ নির্জীব লতার মত একটা শক্ত গাছকে আঁকড়ে ধরে

নয়; সজীব পর-গাছার মত একটা বড় গাছের কাণ্ডের মধ্যে শিকড় চালিয়ে দিয়ে। এ শিকড় কাণ্ডের এত ভেতরে নেমে গেছে যে টানতে গেলে তা ছিঁড়েই যাবে, উপ্‌ড়ে আসবে না। আপনার বাগানের তো সে ক্ষমতা নেই যে শিকড় হীন গাছকে বাঁচিয়ে রাখবেন; নরম লতার মত নরম মাটী থেকে ও যদি উপ্‌ড়ে আস্‌তো, তখন না হয় চেষ্টা করতেন একবার।

—তোমার কাব্যি রাখ প্রদীপ। সূর্য্যকান্ত দীপ্ততর হলেন; রক্ত নেত্রে আবার তাকালেন তিনি; বলে উঠলেন, তোমার উপদেশ আমার কোন কাজেই লাগবে না, কাজেই নিরস্ত থাকতে পার। তোমরা তো সাহিত্যিক, গল্প লেখ, প্রবন্ধ রচনা কর; কবিতায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনায় বিভোর হয়ে থাক। প্লট তোমাদের ষ্টকে থাকে অনেক; আরও একটা বাড়িয়ে নাও; হয়তো কাজে লাগবে।

বলে চল্‌লেন সূর্য্যকান্ত—বহ্নি শিখার বড়, বহ্নি যখন ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেছে, তখন শিখা এ তত্ত্বে ব্যুৎপত্তি লাভ করেনি; তাই ওর কিছুই জানা নেই; আজ সময় হয়েছে তাই বল্‌ছি, জেনে নিক্‌ ও,—বহ্নির জীবনের একটা ইতিহাস।

—মনোজ! কামদেব নয়; আমাদের মতই রক্ত মাংসে গড়া মানুষ; যৌবনের উশৃঙ্খলতায় বহ্নির রূপ-লেখায় নিজেকে হারিয়েছিল; উন্মাদ হয়নি ঠিকই; কিন্তু তার স্তরে নামতেও কুণ্ঠা-বোধ করেনি। একই কলেজে পড়ত ওরা; আমার এখানে প্রায়ই আস্‌তো। মনোজের যৌবন-শ্রী আমারও ভাল

লাগত; বহ্নির পাশে ঠিক মানানসই না হলেও বেমানান হতো না। আর্থিক দিকটা তার ভালই ছিল; বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীও তার কম ছিল না, যে আপত্তি করব। বড় মেয়ে বহ্নির প্রতি আমার ভালবাসা ছিল একটু বেশী, তাই তার ভাললাগা দেবতাকে অপমান করতে আমি অক্ষম হয়েছিলুম। দুজনে এসে আমার আশীর্ব্বাদ চেয়েছিল; মনের অন্তরতম দেশে যে প্রেম সঞ্চিত ছিল, তা আমি উজাড় করে দিলুম; আঘাত দিই-নি একটুও; করেছিলুম আন্তরিক সহযোগিতা। দিয়েছিলুম সহৃদয়তা; প্রাণের জয় তোরণ আনন্দের তালে বেজে উঠেছিল। মনের অবচেতনে অবহেলিত কুসুম-গুচ্ছ নির্মল পাপড়ী মেলে আবার মুখ তুলেছিল। কই তখনতো ভাবিনি; বহ্নি নিভে যাচ্ছে; ভেবেছিলুম, বহ্নি দীপ্ততর হবে। নূতন বসন্তের পল্লব-গুচ্ছে সজীবতা আসবে ঝোড় হাওয়ার দোলনে; যৌবনের স্পন্দন বৃক্ষ শাখে বেজে উঠবে; শুরু হবে হৃদয়ের চঞ্চলা নৃত্য। কিন্তু হল কি? হল বিক্ষিপ্ত ঝঞ্ঝার মঞ্জির উন্মাদিনী কাল-বৈশাখীর ভৈরবী বৈশাখী নৃত্য!

বহ্নির জীবনে বসন্ত চিরবিদায় নিল; উশৃঙ্খল মনোজ বহ্নির আশ্রয় ছেড়ে কামিনীর আশ্রয়ে নিজেকে ডুবিয়ে রাখল। হৃদয়ের দাম দিল না; দাম দিল উশৃঙ্খল জীবনের মাদকতার।

নির্ব্বাণোন্মুখ বহ্নিকে জ্বালিয়ে রাখতে চেয়েছিলুম, বারবার অনুরোধ করেছিলুম কামদেবের আশ্রয় ছেড়ে আমার আশ্রয়ে ফিরে আসার জন্যে; কিন্তু বহ্নি এলো না, সে উত্তর দিল—

তোমার বহ্নি আজও তেমনি আছে, এত শীঘ্র নিভে যাবে এ তোমার ভাবা উচিত হয়নি।

বহ্নি ফিরে আসেনি ঠিকই ; কিন্তু জীবনের ইতিহাসে একটা শিক্ষা হয়েছে আমার, এ শিক্ষা আমার বাস্তব জীবন দিয়ে আমি উপলব্ধি করেছি ; উপলব্ধি করেছি আমার ভেতরকার পিতৃ-হৃদয় দিয়ে। তাইতো বাধা দিচ্ছি আমি, তোমাদের অশুভ মিলনের। তোমাদের কাছে যেটা শুভ, সেটা এখন আমার কাছে অশুভ ; অসুন্দর, কুৎসিত। ভবিষ্যতের ইতিহাস চোখে পড়বে না তোমাদের! তোমরা এখন বর্ত্তমানকে নিয়ে ব্যস্ত ; রঙ্গিন স্বপ্নলোকে তোমরা এখন ঘুমিয়ে আছ ; ঘুম ভাঙ্গেনি তাই, যখনই ভাঙবে তখনই স্বপ্নের পরিবর্ত্তে বাস্তব জগতের নানা বৈচিত্র তোমাদের চোখে পড়বে, দেখবে কল্পনায় এরা ঠাঁই পায়নি ; এরা আশ্রয় পায়নি তোমার স্বপ্ন-লোকের কল্পিত রঙ্গমঞ্চে।

সূর্য্যকান্তের বিশ্লেষণ প্রদীপের আত্ম-সম্মানে আঘাত করেছিল কিনা জানি না ; মনে হয়, প্রদীপ সূর্য্যকান্তের অভিমত সমর্থন করেনি একটুও ; প্রতিবাদও আর করতে চাইল না সে, নির্বাক হয়ে এতক্ষণ সে সূর্য্যকান্তের আত্ম-সমর্থন শুনে যাচ্ছিল ; এবার বিদায় চাইল ; সূর্য্যকান্ত বাধা দিলেন না।

বিদায় নেওয়ার পূর্ব্বে একবার শিখার সঙ্গসুখ প্রত্যাশা করেছিল প্রদীপ ; শিখাও চেয়েছিল। কিন্তু সূর্য্যকান্তের রুক্ষ প্রলয়ের যে বিষাণ ধ্বনিত হয়েছিল ; তাতে প্রদীপের প্রত্যাশা,

অনাদৃত বাগানের স্খলিত পুষ্পের মত ধূলি-ধূসর মাটিতে আশ্রয় নিয়ে ছিল।

প্রদীপ সেদিন কিছুই ব্যক্ত করতে পারেনি; ফিরে এসেছিল একান্ত মৌন হয়ে, আপন গৃহাভ্যন্তরে।

শিখা ছিল, রুক্ষ-ধরণীতে ক্লান্ত কপোতের মত ক্ষীণ দুর্ব্বল হয়ে।

চার

পরেরদিন প্রদীপের সূর্য্য উঠার স্বপ্ন নিয়ে ঘুম ভাঙ্গে; কারণ এই পরের দিনটায় প্রদীপের পূর্ণ বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ আসে। সুযোগ আসে আত্ম-প্রতিষ্ঠার; কর্মময় জীবনের সংঘাত-ময় গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখার। সাহিত্যে প্রদীপের অন্তর-মুখী মন আচ্ছন্ন ছিল ঠিকই। বহির্জগৎ প্রদীপের কাছে অপরিচিত ছিল, কারণ প্রেয়মন, শ্রেয়মন নিমগ্ন ছিল—সাহিত্য-সাধনায়; মাঝখানে এই মনদ্বয়কে জাগিয়ে রেখেছিল প্রদীপের প্রজ্জ্বলিত দীপ-শিখা!

আজ এ দীপ-শিখা প্রজ্জ্বলিত ছিল কি-না জানি না, তবে বাস্তব জীবনের দুর্বিপাকে উজ্বল শিখা একবার কেঁপে উঠে ছিল ঠিকই, কিন্তু বহির জীবনের বিক্ষিপ্ত ঝঞ্ঝারমঞ্জির উন্মাদিনী কাল-বৈশাখীর ভৈরবী বৈশাখী নৃত্য প্রদীপের শিখাকে স্পর্শ করতে

পারেনি, কিম্বা স্পর্শ করার স্বপ্নও সে দেখেনি, তাই বুঝি শিখা জ্বলেছিল এখনও প্রদীপের দ্বিধা-ভরা, দ্বন্দ্বলাগা মনের অবচেতনে! এ দ্বিধা দ্বন্দ, শিখা নিভে যাবার ভয়ে নয়, মানব মনের বহির্ভাগে যে জগৎ আছে, সে জগতে শিখার জ্বলে থাকা সম্ভব হবে কি-না, এই চিন্তায়, আতঙ্কে!

মিঃ গাঙ্গুলী নীচু তলার আঁধারে আলোর আশায় বসেছিলেন; আলো বাতাস হীন গলির ভিতরকার ছোট একটা ঘরে ভিজে ড্যাম্পের গুমট গন্ধ তাঁর ভাল লাগেনি ঠিকই, কিন্তু তবুও কেমন যেন একটা নিবিড় আকর্ষণ ছিল এখানে; প্রদীপ হয়তো আসবে এখুনি, এলে পর এই ভাল না লাগা কষ্টটার জন্যে মনটা একটু ব্যথা পাবে; মনে হবে এত শীঘ্র এই কষ্টটা লাঘব হয়ে গেল কেন? এটার স্থায়িত্ব আরও একটু বেশী হলে বোধ হয় মন্দ হতো না! এটা তো এই গুমট গন্ধের আকর্ষণেই! হয়তো তাই, ক্ষণিক মন্দও মানুষের মনে ভাল লাগার চেয়েও বোধ হয় মাঝে মাঝে মন্দ লাগে না। তাইতো প্রদীপের বিশেষ মন্দ লাগছিল না, গত কালের সংঘাতময় মুহূর্ত্তের ক্ষণিক মুহূর্ত্তগুলো।

প্রদীপের চিন্তারাশি বাধা পেল তখনই; যখনই মনে হ'ল নীচের ঘরে মিঃ গাঙ্গুলী, প্রদীপের শুভাগমনের আশায় পথ চেয়ে আছেন।

নীচে নেমে এলো প্রদীপ!

—সুপ্রাতঃ হে সাহিত্যিক! অভিবাদন জানালেন মিঃ গাঙ্গুলী।

—সুপ্রাতঃ! এত সকালে যে? ঘুমের আমেজ ভোগ করা কি আপনার ধর্মের বাইরে? আমার কিন্তু ঘুমের চেয়ে এই ঘুমের আমেজটা বেশ লাগে; এর জন্যে ক্ষতি হয় বেশ। কিন্তু লাভক্ষতির অঙ্ক তো চিরকালই এড়িয়ে গেছি, তাই লাভের চেয়ে ক্ষতিটাকেই স্বীকার করে নিয়েছি মনে প্রাণে। ঘরের ভেতর তাইতো এত অন্ধকার; আলো আসে দেরীতে; অন্ধকারকেই আঁকড়ে থাকতে হয় অনেকক্ষণ ধরে। এই দেখুন না আমার জীবনটা; আলোর মুখ এখনও দেখলুম না, সাধারণকে দেখাব কি করে বলতে পারেন? এটা শুধু আমার একার জীবন নয়; আমি একটা নিদর্শন; সাহিত্যিক জাতের নিদর্শন। দুর্ভিক্ষের দেশে আর্টের সাধনায় মগ্ন যারা থাকে, তারা বোধ হয় নির্বোধ; ভাবে—অভাব অনাহারক্লিষ্ট, দুর্ভিক্ষ-জর্জরিত জাতির মুখে একটু যদি হাসি ফোটাতে পারি, একটু যদি আনন্দ দিতে পারি,—এই নিরানন্দ একঘেয়ে জীবনে। কিন্তু হায় এই হাসি আর আনন্দ দিতে গিয়ে শিল্পীর মনের হাসি-আনন্দই যে শেষ হয়ে যায়। তবু যারা জাতশিল্পী, শিল্প-সাধনা তারা এড়িয়ে যাবে কোন অজুহাতে বলতে পারেন? আপনারা ধনী, তৃণশূন্য ভূধর কান্তারে বিরাট অশ্বত্থবৃক্ষ; আর পাঁচটা গাছ, যারা আপনার আশেপাশে ছিল, তাদের যে ক্ষমতা অল্প, অত তলায় গিয়ে খাদ্য শোষার প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠবার ক্ষমতা তো তাদের নেই;

তারা দুর্বল, উপযুক্ত খাদ্যের অভাব হলে নীরবে শুকিয়ে মরে যায়; কিন্তু প্রতিবাদ করার স্পৃহা জাগে না। কারণ তারা জানে প্রকৃতি—একার খাদ্য যোগাতেই অস্থির হয়ে উঠেন; তাদের খাদ্য আসবে কোথা থেকে? প্রকৃতির ক্ষমতা তাদের জানা আছে; শুধু জানা নয়, তার নিরপেক্ষতা দেখেও তারা মুগ্ধ হয়েছে।

—প্রদীপ বাবু ক্ষমা করুন, আমি অশ্বত্থ বৃক্ষের দলে হয়েও উলুখাগড়ার দলে মিশতে চাই। আপনি বল্‌বেন দয়া; দয়া করা আমাদের সাজে না; আমরা বড় স্বার্থপর, দয়া কাকে বলে জানি না, তৃণ-খাগড়াই তো আমাদের দয়া করে এসেছে; আমরা দয়ার দান গ্রহণ করে পরিপুষ্ট হয়েছি; এখন আমাদেরও সময় এসেছে,— যাদের দয়ায় আমরা বেঁচেছি, তাদের বাঁচানোর। কিন্তু ও কথা থাক্ প্রদীপ বাবু, শিল্পের-সাধনায় যারা নিজেদের-মগ্ন রেখেছে তারা উদার; সময়ের দুর্ব্বিপাকে তাদের কলমে অনেক কথাই এসে পড়ে, এটাও বোধ হয় তেমনি এসে পড়েছে; এবার একথার ছেদ টানা যাক্, কি বলেন?

—আমার কোন আপত্তি নেই; আলোচনার ফাঁকে কখন যে অর্থনীতি ঢুকে পড়েছিল, তা আমি বুঝতে পারিনি; তাই এত কথা বলে আপনাকে অপদস্থ করেছি; ক্ষমা করুন! কিন্তু একটা কথা আরও বলার আছে, সেটা বলেই আমার অর্থনীতির বক্তব্য আমি শেষ করছি। —বাঁচার সমস্যা থেকে কি শিল্পী বাদ পড়ে? পড়ে না বোধ হয়!

—না পড়ে না! মিঃ গাঙ্গুলী প্রদীপের কথা সমর্থন ক'রে সেদিনের অর্থনীতিতে ছেদ টান্‌লেন।

শুরু কর্‌লেন,—সাহিত্য তো বাঙ্গালীর মজ্জার সঙ্গে মিশে আছে, একে বাদ দিয়ে বাঙ্গালী বাঁচতে পারে না; তাই বুদ্ধির অঙ্কুর উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সাহিত্য ভাললাগে, কবিতা পড়তে ইচ্ছে হয়, সাহিত্যানুরাগীদের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়ে উঠে।

তরুণ মনে এই সাহিত্যের প্রভাব এত বেশী যে তখনই তা প্রকাশের জন্যে তরুণ মন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠে। এই প্রকাশের একমাত্র উপায় হাতে লেখা পত্রিকার আশ্রয় নেওয়া। তরুণ মনকে তার যোগ্য স্থানেই বসাতে পারে, এই হাতে লেখা পত্রিকা, হাতে লেখা পত্রিকায় আশ্রয় নেওয়ার পেছনে আত্মপ্রচারের বিশেষ ইচ্ছে থাকে না; কারণ তরুণ বয়স তো গড়ার বয়স; গড়ার সময় প্রচার নাই বা হ'ল, প্রচার হোক গড়ার পর। ভিত্তি গড়ার উপরে ইমারতের স্থায়িত্ব বা বিস্তার নির্ভর করে। যে ইমারতের ভিত্তি ভাল নয়, সে ইমারৎ বেশীদিন টিঁকে থাকতে পারে না। এখন আমাদের সেই ভিত্তিগড়া হয়ে গেছে; এখন আমাদের প্রকাশ হোক, এটা আমরা সকলেই চাই; সাহিত্য-বাসরে এই কথাই আপানাকে বলি বলি করেও বলা হয়নি। আজ এসেছি এ কথা বল্‌তে নয়, জানাতে; আমরা সকলে ঠিক করেছি আমাদের হাতে লেখা পত্রিকা 'প্রবাহ'কে সকলের সামনে তুলে ধরে আমাদেব সাহিত্য-সৃষ্টি প্রচার কর্‌ব। মন্দিরে পূজার

নৈবেদ্য নিয়ে যেমন পুরোহিতের দ্বারে উপস্থিত হতে হয়; পুরোহিত নৈবেদ্য ভগবানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দেন; তেমনি আপনি আমাদের পুরোহিত; লেখার নৈবেদ্য সাজিয়ে আপনার দ্বারে উপস্থিত হবো; আপনি মানব-সমাজের উদ্দেশ্যে তা উৎসর্গ করে দেবেন। আমাদের এ অনুরোধের দাবী উপেক্ষা আপনার করা চল্‌বে না।

মিঃ গাঙ্গুলীর 'প্রবাহ' প্রচারের অনুরোধ বা দাবী প্রদীপ মনে মনে আলোচনা ক'রে, মিঃ গাঙ্গুলীকে কথা দিয়ে দিল।

'প্রবাহ' প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নিজের আত্ম-প্রচারের প্রলোভন প্রদীপ এড়িয়ে যেতে পারে নি, তাই; শুধু কি তাই? তাই নয়; পেছনে আছে কর্মময় জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে শিখাকে ভুলে থাকার প্রাণপণ আকাঙ্খা!

হায়, প্রদাপ তো জানে না, গত দশ বছরের মেলা মেশায় যে সখ্য গড়ে উঠেছে, তা এত শীঘ্র মোছার নয়। ভূমিকম্পে ইমারৎ ভেঙ্গে পড়লেও, ভিত্তি তার অটুট থাকে। কারণ ভিত্তির উপরই তো ইমারৎ গড়ে উঠেছিল। ভিত্তি যদি না থাকতো, ইমারৎ গড়ার স্বপ্নও কেউ দেখ্‌তো না।

পাঁচ

প্রদীপ-সম্পাদিত 'প্রবাহে'র প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করেছে সাড়ম্বরে ; কর্মক্লান্ত প্রদীপ এখন আবার কর্মব্যস্ত হয়ে উঠেছে। নব-উন্মাদনার দীপ্ত আভা· ফুটে উঠেছে ঠিকই, কর্মময় জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে প্রদীপ নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আলো-বিস্তারের চেষ্টা করছে ; ম্লান আলোয় কিন্তু তাকেই ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না ; নাই বা দেখা গেল, অন্ধকার সুড়ঙ্গে আলোর মৃদু শিখার স্পর্শে এগিয়ে চলেছে সে, সে একা নয় সঙ্গে নিয়ে চলেছে তার সাহিত্য গোষ্ঠির সবাইকে।

'প্রবাহে'র প্রথম প্রকাশ সাহিত্য জগতে নতুন প্রবাহ বহিয়ে দিল ; বাংলা সাহিত্যে নতুন সাড়া এনে নতুন যুগের সৃষ্টি কর্‌লো।

এতদিন যারা পুরাণ যুগের আবর্ত্তে নতুন কিছুরই সন্ধান পায় নি, কেবল পুনরাবৃত্তি দেখে আসছে, তারা সবাই 'প্রবাহ'কে আঁকড়ে ধরল প্রাণপণে। অভিবাদন দিয়ে প্রেরণা দিতে লাগল প্রদীপকে অনেকে। অনেকে আবার দেখা করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে যেতে লাগ্‌ল। প্রশংসা বা অভিনন্দন প্রদীপ যথেষ্টই আশা করেছিল ; কিন্তু দ্বিধা এসে প্রদীপকে তা গ্রহণে বাধা দিল।

প্রদীপের বাড়ীর নিচেতলার ঘরে 'প্রবাহে'র কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; ঠিক কার্যালয় নয়, প্রকাশালয়। প্রকাশালয়ে 'প্রবাহে'র কার্য্য নির্ব্বাহ করার জন্য প্রদীপের বন্ধু-মণ্ডল সুজিত,

কাজল, প্রবীর এসে স্ব-ইচ্ছায় নানা কাজের ভার গ্রহণ করে প্রদীপকে সাহায্য করে চলেছে। প্রদীপকে এখন সম্পাদকের আসনে বেশ মানায়। স্প্রীং-ডোরের ভিতরে পার্টিশন ঘেরা ছোট ঘরে প্রদীপকে এখন লেখা বাছা, প্রুফ্ দেখা, সম্পাদকীয় লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। সাহিত্য-সাধনা তার বন্ধ হয়েছে, 'প্রবাহে'র কাজে নিজের অস্তিত্ব সে বিলিয়ে দিতে চলেছে; অনেকের ধারণা প্রদীপের অস্তিত্বের ভীত্ দৃঢ়তর হচ্ছে; কিন্তু একটু তলিয়ে দেখ্লেই চোখে পড়বে, প্রদীপ ক্রমশঃই রিক্ত হয়ে উঠ্ছে; একেবারে নিঃশ্ব হয়নি তাই, যখন নিজেকে একেবারেই রিক্ত করে দেবে, তখন প্রদীপের দৈন্যের অবস্থা যে কোনও দরদী-বন্ধুর চোখে জল এনে দেবে।

অর্থ-নৈতিক কচ্কচানীতে 'প্রবাহে'র সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিকই; শুধু সৌন্দর্য্যই নয়, প্রতিষ্ঠাও দৃঢ়তর হচ্ছে। প্রদীপ কিন্তু নিজেকে যেন হারিয়ে ফেল্ছে ক্রমশঃ।

কর্মব্যস্ত জীবনে প্রদীপ ভেবেছিল, শিখার স্মৃতি পাত্লা হ'য়ে আসবে। ছবি মাঝে মাঝে ভেসে উঠবে ঠিকই, কিন্তু তাকে এড়িয়ে যেতে আবার কাজে মন দেবে সে; তাতে নিজেকে অন্ততঃ কিছুদিন চালিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হবে প্রদীপ।

কিন্তু সামর্থ যার নেই, সে নিজেকে চালিয়ে নিয়ে যাবে কি করে?

ইট্ কাঠে ঘেরা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে পোকা বাছার কাজে হাঁপিয়ে উঠে সে। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে, শিখার স্মৃতি বুকের

ভেতরটায় নানা ভাবে আঘাত দেয়; ব্যথাতুর করে তোলে প্রদীপের অন্তরমুখীন্ মনকে। যে শিখার কথা বারবার সে এখন এড়িয়ে যেতে চায়, সেই শিখাই বারবার এসে প্রদীপের মনের দ্বারে টোকা মেরে চলে।

যখন একান্তই শিখাকে এড়িয়ে চলা প্রদীপের শক্তির বাইরে বলে মনে হয়, তখন কর্মব্যস্ত জীবনের ফাঁকে নির্জন একটা কক্ষে প্রদীপ শিখার কথা ভেবে চলে; শিখাকে কেন্দ্র করে বলে যায়, —শিখা, তুমি প্রদীপের, তুমি সুন্দরের, আমার হৃদয়ের। তুমি প্রেরণার উৎস, তুমি আমার কবিতা। আজ থেকে প্রায় দশ বছর পূর্ব্বে শরতের বৃষ্টি ধোয়া নীল আকাশের তলায় পূণ্য পবিত্র মহাসপ্তমীতে শারদীয়া পূজা মণ্ডপে তুমি যখন পূজারী হয়ে অঞ্জলির ফুল পুণ্যার্থীদের হাতে তুলে দিচ্ছিলে; তখন তো তুমি চিন্তা করতেও পারনি এই পুণ্যার্থীদের দলে একান্ত সাধারণ বেশে আছে তোমার অসাধারণ, তোমার আশ্রয় কেন্দ্র প্রদীপ।

মনে পড়ে? তুমি যখন বেলপাতার দুটো টুক্‌রো মহাপূজার অঞ্জলির জন্যে আমার হাতে তুলে দিলে, তখন প্রথম তোমার হাতে হাত ঠেকেছিল, স্পর্শেন্দ্রিয়ের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায় তোমার কচি হাতের নরম স্পর্শ প্রথম অনুভব করেছিলুম; আঙ্গুলে আঙ্গুলে যে কথা হয়েছিল, সে কথা কি ভুলে গেলে? ভুলে গেলে,—

"প্রথম জীবন পথে, বাহিরিয়া এ জগতে,—
কেমনে বাঁধিয়া গেল নয়নে নয়ন।"

সুখের কানন তলে, হৃদয়ের বেদনা মাঝে, যে অনন্ত বাসর-সুখ অনুভব করেছিলুম ; তার যবনিকা কি এত শীঘ্র জীবনের রঙ্গমঞ্চে নেমে আস্‌বে ?

শিখা তুমি প্রদীপের শিখা ; প্রদীপ আজ নিভু নিভু, বাইরের জগতে সে এখন বেঁচে আছে সজীবতার পরিপূর্ণ জীবনী শক্তিতে; কিন্তু অন্তর তার শিথিল হয়ে এসেছে ; স্পন্দন যেন থেমে যায় ; ক্লান্তি আসে দেহ মন ঘিরে। যৌবনের দীপ্ত আভা ম্লান হয়ে যায়। এক-দিনেই যেন যৌবন বিদায় নেবার নোটিশ জারি করতে চায় ; গলার কাছে থাক পড়তে শুরু করে, চোখের নিচেটা ঢিলে হয়ে উঠে ; মাংস পেশীতে শিথিলতা আসে।···

চিন্তার স্রোত বহে চলে প্রদীপের ; ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হয়ে আসে ; শুক্লা-একাদশীর চাঁদ ম্লান আলো ছড়িয়ে আকাশের ফাঁকে দীপ জ্বেলে দেয়।

প্রবীরের ডাকে লজ্জায় সম্বিত ফিরে পায় প্রদীপ।

শিখার চিন্তায় ছেদ পড়ে।

প্রবাহ' ঠিকই বহে চলে।······

ছয়

বহ্নি এসেছে সূর্য্যকান্তের আশ্রয়ে, পিতার অনুরোধে নয়; নিজের ইচ্ছায়; একঘেয়ে জীবনের ফাঁকে একটু পরিবর্ত্তন আনতে।

কিন্তু বহ্নির আগমন, সূর্য্যকান্তের কাছে অপ্রত্যাশিত নয়, সূর্য্যকান্ত প্রত্যাশা করেছিলেন বহ্নিকে; শিখার তো মা নেই, বহ্নিই তার মায়ের মতো; শিখা এখন বড় একা। বিবর্ত্তমান জীবনের ঘুর্ণিপাকে শিখা এখন এমন একস্তরে এসে পৌঁছেছে, যেখানে নিঃসঙ্গ জীবন তার ভাল লাগলেও ভাল লাগান উচিৎ নয়।

শিখা বড় একা, দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট কাজ এখন পুরমাত্রায় এড়িয়ে চলে সে; কলেজ-জীবনের লাস্যতা সে এখন ঘৃণা করে; চঞ্চলা শিখা এখন অচঞ্চলা, দীপ্তি হীনা। রুটিং করা জীবন এখন রুটিং মানতে চায় না। স্নান খাওয়াও সে এড়িয়ে যেতে চায়। সূর্য্যকান্তের চোখের বাইরে থেকে নিজের ছোট ঘরটীতে শিখা দপ্ দপ্ করে জ্বলে; নিভে গেলে যেন ভাল হয়; জ্বলতে আর চায় না সে। প্রদীপের কথা চিন্তাকরেই জ্বলে রয়েছে সে। শিখা নিভে গেলে প্রদীপের অস্তিত্ব থাকবে না; শিখা তা জানে। শিখা আরও জানে, শিখার অভাবে অন্ধকারে প্রদীপের মূল্য কেউ দেবে না। আলো বিকিরণের ক্ষমতা তার লোপ পাবে যে। শিখা জ্বলে রয়েছে তাই!

—শিখা তোর দিদি এসেছে, দরজা খোল। সূর্য্যকান্ত স্নেহের আশ্রয় নিয়েছেন। রুক্ষতা কেটে এসেছে খানিকটা।

শিখা দরজা খুলে দিল; আটপৌরে শাড়ী পরা সাধারণ গৃহিণীর বেশে বিবর্ণ বহ্নিকে দেখে শিউরে উঠল শিখা।

বহ্নিও আতঙ্কে কেঁপে উঠল, শিখার ফ্যাকাশে তাম্রদগ্ধ চেহারা দেখে।

সূর্য্যকান্তের কাছে শিখার জীবনের আশ্রয়-চ্যুতির ঘটনা সবই শুনেছিল বহ্নি। বহ্নি শুনেছিল, প্রদীপ এসেছিল শিখাকে গ্রহণ করতে, শিখার আকাঙ্খিত আসনে শিখাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু সূর্য্যকান্তের উপমার বিশ্লেষণে প্রদীপ নিরাশ হয়েছিল, নিজেকে অপমানিত বোধ করল; শিল্পী মনের নরম হৃদয়ে মৃদু আঘাত বড় হয়ে দেখা দিল যে।

বহ্নি ডাকলো,—শিখা।

শিখা পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠল;—আমায় ডাকছো দিদি!

—হাঁ ঘরে চল, তোর সঙ্গে দুটো কথা বলে এতদিনের ব্যবধানটা একটু কমিয়ে আনি। ঠিক যেন পর হয়ে গেছি।

শিখা দিদিকে অনুসরণ করে তার শোয়ার ঘরে এসে উপস্থিত হল।

—শিখা ছিলি কচি ফুলের মত, ভ্রমরের স্পর্শে সাড়া না দিলেই পারতিস থাকতিস ফুলের মতই নির্ব্বিকার। শিখা ফুলরা বড় নিষ্ঠুর না? ভ্রমর এসে বারবার ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ফুলের

দোরে ভিক্ষে চায়; কিন্তু ফুল ভ্রমরের ডাকে সাড়া দেওয়াও সমিচীন মনে করে না, কিন্তু তবুও ফুল ভ্রমরের কাছে পরিত্রাণ পায় কি? পায় না! নির্ব্বিকার থেকেও পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়; তবুও বল্‌ব,—শিখা তুই নির্ব্বিকার থাকতে পারলি না?

—না দিদি!

—প্রদীপ এসেছিল, বাবা তার অবমাননা করেছেন না? দীর্ঘশ্বাস চেপে গেল বহ্নি।

—হাঁ দিদি।

—শিখা ফিরে আসতে পারবি না আর? প্রদীপকেই কি মেনে নিয়েছিস মনে প্রাণে?

—হাঁ দিদি।

—ফিরে আস্‌তে বলি না তোকে, আর পাঁচজনের মত ভালবাসার অবমাননা করিসনি তুই; মহতের স্পর্শে যখন এসেছিস একবার, তখন মহত্‌কেই মনে রাখিস; ওই পবিত্র মনটার মধ্যে আর কাউকে ঢুকতে দিসনি ভাই। একনিষ্ঠ সাধনা থাকলে মানুষ ভগবানকেই লাভ করে, মানুষ তো তুচ্ছ; বাবা যতই বিরুদ্ধে যান না কেন, আমি তোর দিকে আছি, থাক্‌বোও।

শিখা মুখ নীচু কর্‌লো।

—আমায় ভুল বুঝিস্‌নে শিখা, আমি তোর দলে।

—আমার জন্যে তুমি কেন কষ্ট পাবে দিদি?

—কষ্ট কিরে! তুই যে আমার বোন্; মেয়ে নেই মেয়ের মতন।

শিখা চুপ করে গেল !

—আমার একটা কথা রাখবি শিখা ?

—কি বল !

—তুই যা প্রদীপের কাছে, বাবার অবমাননার জন্যে ক্ষমা চেয়ে আয় ; আর দেখ্, তুই অত মুস্ড়ে পড়িস্নি। যাকে ভালবাসিস তার সাধনাকে রূপ দিতে চেষ্টা কর। শিল্পীর মায়া-মুকুরে তোর ছবি আঁকা আছে ঠিকই ; সেই ছবিকে তুই একটু সতেজ করে দে। তার কাজে নিজেকে বিলিয়ে দে ; দেখ্ মেয়েরা যত দুঃখী, পুরুষরাও তার চেয়ে কোন অংশেই কম নয় ; আমার মতে মেয়েরা ঠিক পুরুষদের মত ভালবাসতে জানে না ; ভালবাসতে জান্লে ভালবাসার দাম দিত ঠিকই। পুরুষরা ভালবাসার দাম দেয় কেন ? কারণ, তারা যে ভোগী, তাই ত্যাগীও হতে পারে। ভালবাসে তাই ভালবাসার জন্যে জীবনের অনেক কিছুই তারা ত্যাগ করে দেয়। শিল্পীর প্রতিভা বিস্তারের মূলে যদি কোন নারীর প্রেরণা থাকে। যদি কোনও কারণে সে নারীর প্রেরণা লোপ পায়, তবে শিল্পীর তুলি ভোঁতা হবে ঠিকই। কারণ যার স্পর্শে তুলিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তার অভাবে পুরুষ সে তুলিতে আর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে রাজী নয় !

শিখার নীরবতা তখনও ভাঙ্গেনি।

—হাঁরে প্রদীপের কোনও খবর পেয়েছিস ? কেমন আছে সে।—জিজ্ঞাসা করল বহ্নি।

শিখা জবাব দিল,—ভালই আছে, দেখছ না 'প্রবাহে'র বিস্তার!

—বাইরেটা দেখে বিচার করা তোর শোভা পায় না শিখা।

শিখার এ কথা বলা ঠিক হয়নি, সেদিন সে লজ্জায় আরক্ত হ'য়ে উঠেছিল। মনে মনে বলেছিল,—সত্যিই আমারও কি অন্তর্দৃষ্টি নেই। সাধারণের দৃষ্টি নিয়ে আমিও কি আজ সাধারণের দলে? হয়তো তাই; তাই যদি না হবে, আমারও চোখে আঙ্গুল দিয়ে কি দেখিয়ে দিতে হবে, প্রদীপের বাইরের বিস্তার, অন্তরের বিস্তার নয়।

সাত

বহ্নির নির্দ্দেশ শিখার মনে পরিবর্ত্তন এনেছে খানিকটা। সমস্যার ঢেউ-এ তলিয়ে যাচ্ছিল শিখা, তীর খুঁজে পায়নি, এখন আবার গাংচিলের আনাগোনা শুরু হয়েছে, সমুদ্র তীরের শ্যামল বনানী দৃষ্টি-গোচর হয়েছে; তাইতো শিখা প্রদীপের খোঁজে 'প্রবাহে'র প্রকাশালয়ে এসে উপস্থিত।

প্রদীপ ছিল না সেখানে, 'প্রবাহে'র কাজে ডাক পড়েছিল তার, তাইতো তাকে যেতে হয়েছিল কর্ত্তব্যের কঠোর আহ্বানে, পরপারের ডাকে। ফিরে এসে স্তম্ভিত হয়ে ছিল সে, ঠিক স্তম্ভিত নয়, হতভম্বের মত। শিখাকে আশা করেনি সে, কিন্তু

ঈশ্বরের অপ্রত্যাশিত আশীর্ব্বাদ মাথা পেতে নিয়েছিল ; অনেক-খানি ক্লান্তি কেটে এসেছিল তার ; ফ্যাকাশে মুখ দীপ্ত হয়েছিল। শিখাকেও বেশ খানিকটা সতেজ দেখাল ; গোপন অশ্রু ধরা পড়েনি তার, তবে ম্লান হাসি ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছিল ঠিকই।

মেঘ বুঝি কেটে এসেছিল ; ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্যের সূচনা বুঝি লোপ পেয়েছিল ; তাইতো শিখা জ্বলে উঠেছে, ঠিক পূর্ব্বের মত উজ্জ্বল হয়ে নয় ; একটু ম্লান ভাবে। তাইতো প্রদীপ প্রশ্ন করেছিল,—শিখা হঠাৎ জ্বলে উঠ্‌লে কেন ? এ জ্বলা প্রত্যাশিত, না অপ্রত্যাশিত ; হঠাৎ নিভে যাবার পূর্বে বজ্রের মত কি জ্বলে উঠা ? না আলেয়ার মত ভ্রান্ত পথিককে বিভ্রান্ত করে দেওয়ার চেষ্টা ?

—ঠিক যে কি তা আমিও জানি না ! মনে হয় শেষের আগের কথা, আমার এ আসার সঙ্গে মিলে যাবে। মৃত্যু হবার আগে মুমূর্ষু-ব্যক্তি যেমন শেষবারের মত হাসে, আমার এ হাসি ঠিক তেমনি। আমার এ আসা হয়তো বিদায় নেবার পূর্বে একবার শেষ দেখা ; কারণ মানুষের আশা মানুষের কাছে মূল্যবান, ঈশ্বরের কাছে, নিয়তির কাছে, তার কোন দামই নেই। মানুষের আশার কোনও মূল্য যদি থাক্‌তো, তবে পৃথিবীর ইতিহাসে রামায়ণের সৃষ্টি হতো না। মহাকাব্য কল্পনার অতীত হয়ে থাকতো ; বাল্মিকীর দুর্দ্দান্ত

প্রতাপ, তার নরহত্যার কাহিনী আমাদের আতঙ্ক জাগাত; রামচন্দ্রের বিরহ চোখে জল আন্‌তো না!

—আশা ভঙ্গের প্রথম পর্ব্বের পরিসমাপ্তি হয়েছে অনেক-দিন; এর পরেও কি আরও কোন আশার পথ তুমি চেয়ে আছ?

—প্রথম পর্ব্ব শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু দ্বিতীয় পর্ব্ব তো শুরু হয়নি এখনও। আজ হবে এই দ্বিতীয় পর্ব্বের শুরু; মহা-ভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বের মত আমার পর্ব্ব এত বিরাট নয়; দ্বিতীয় পর্ব্বেই এর শেষ।

—এই দ্বিতীয় পর্ব্বের সূচনা কোথা থেকে হবে, তাকি জানতে পারি না?

—না পারার কি আছে। সূচনা করার জন্যেই তো আসা। এতদিনের ব্যবধানে যে অভাব সব চেয়ে বেশী আমার মনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, তা হল তোমার জীবনের সহৃদয় প্রেরণার অভাব; ঠিক প্রেরণার অভাবও বলা যায় না, কারণ প্রেরণা ঠিক লোপ পায়নি এখনও; প্রকৃত সহযোগীর অভাব!

—প্রেরণা বা প্রকৃত সহযোগীর অভাব অনুভব করলে 'প্রবাহে'র প্রবাহ কি এত স্বতেজ হতো? হতো না বোধ হয়,—মন্দাকিনীর ক্ষীণ কল-কাকলীর ঐক্যতানে 'প্রবাহ' বহে চল্‌ত হয়তো; কিন্তু মানুষের মন ভাঙ্গতে পারতো না। মনভাঙ্গার ক্ষমতা মন না পেলে লোপ পায়, এ তোমার জানা উচিৎ ছিল শিখা! অন্ততঃ এ বিশ্বাস ছিল, মনভাঙ্গার সতেজ ক্ষমতায় যে

মন একবার ভেঙ্গেছি, শত আঘাত-সংঘাতের 'আবর্ত্তে তার পরিবর্ত্তন আসবে না সহজে।

—বুঝেছি।

—কি বুঝেছ শিখা ?

—এই বুঝেছি, 'প্রবাহে'র প্রবাহকে সতেজ করে রাখতে আর নতুন প্রেরণার প্রয়োজন নেই।

—আছে বৈকি শিখা।

—আছে ?

—কেন নেই ? জমান সম্পত্তি ভাঙ্গিয়ে কিছুদিন চলে ঠিকই ; কিন্তু চিরদিন চলে না ; চিরদিন চালাতে হ'লে সম্পত্তি বাড়াতে হয় ; ঠিক বাড়াতে নয় ; যাতে চিরদিন চলে, তার উপযুক্ত সম্পত্তি হাতে রাখতে হয়।

—তোমার যা সম্পত্তি, তাতে কি চিরদিন চল্‌বে না ?

—না শিখা।

—কেন নয় ?

—চিরদিন চলার উপযুক্ত সম্পত্তি আমার নেই, তাই চিরদিন চলবে না।

—তবে বল, আমি যা চাই তা পাব ?

—কি চাও তুমি ?

—আমি চাই, এমনি চিরদিন তোমার পাশে থেকে তোমার কাজে প্রেরণা জোগাতে, চিরদিন চলার উপযুক্ত সম্পত্তি তোমার গড়ে তুলতে। বল রাজী আছ। বল, চুপ করে থেকো না।

শিখার ব্যবহারে এই প্রথম ব্যাকুলতা প্রকাশ পেল; প্রদীপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অপেক্ষা এই ব্যাকুলতা লক্ষ্য করল আগে।

শিখা প্রশ্ন করল আবার,—প্রদীপ দা আমার চাওয়াকে তুমি কি সমর্থন কর না?

—অসমর্থন করার কি আছে; তবে···

—তবে কি? কিসে দ্বিধা!

—অসামাজিক সহযোগিতা তোমার বাবা কি সমর্থন করবেন?

—এতদিন তো করে এসেছেন।

—এতদিনে আর আজকে অনেক পার্থক্য শিখা! তোমার আমার জীবনের একটী বোঝা পড়া তিনি সেদিন করে দিয়েছেন; এটা তো তুমি বোঝ!

—ঠিক বুঝি না, কারণ তিনি বোঝা পড়া কিছুই করে দেননি; সমস্যা ঘুলিয়ে তুলেছেন আরও খানিকটা!

—ঠিক ঘুলিয়ে তুলেছেন এই কি তোমার সত্যিকারের ধারণা শিখা! আমি কিন্তু এই টুকুই শুধু মনে করি যে, তোমার আমার মধ্যে একটা বোঝা-পড়া করে দিয়েছেন তিনি; যদিও সমস্যার সমাধানটা এখনো করে দেননি।

—প্রদীপদা এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় বলেই কি তিনি সমস্যার সমাধান করে দেননি?

—কে বললে তা, এ পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কোন সমস্যাই

নেই যে শিখা ! আমার মতে এ পৃথিবীর সমস্ত সমস্যারই সমাধান হতে পারে। শুধু সমস্যাটাকে একটু তরল করে নিতে হয় এই যা।

—কি করে তরল করা সম্ভব ?

—উপায় একটা আছে, সে উপায়ে পা দিলে, একটু আদর্শ ভ্রষ্ট হ'তে হয়। একটু নিচে নেমে আসতে হয়। কিন্তু এই নিচে নামার যুক্তি আমি তোমায় দেব না শিখা। তুমি শিখা, তুমি অম্বরের আকর্ষণে উপরের দিকে চেয়ে থাক ; নিচে তাকাতে যাবে কেন ? আমি সহ্য করে নিতে পারব। না পারার কি আছে, যে মনটা চেয়ে এসেছি এতদিন, সেটার পাওয়া তো হয়ে গেছে !

—আর কিছু পাওয়ার কি নেই ?

—আছে ! কিন্তু অধিকার নেই।

—সমস্যার সমাধান করে অধিকার করে নাও না।

—বলছি তো নিচে নামতে হয়।

—আমি নামতে রাজী আছি ; কিন্তু তোমায় নামাতে নয়।

—আমারও ওই একই অবস্থা, আমি নামতে রাজী আছি ; তোমাকে নামাতে নয়।

—কেন নয় ?

—তুমি যে শিখা।

—শিখা কি নিচে নামতে পারে না ?

—না।

—কেন ?

—এ কেন-র উত্তর আমি দিতে রাজী নই, শুধু এ টুকুই বল্‌তে রাজী যে সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তোমায় নিচে টান্‌তে পারব না।

—আমি তো নিচে নামতে চাই !

—চাও নামতে ?

—তোমায় পাওয়ার পরিবর্ত্তে, আমি সমস্ত কিছুই মেনে নিতে রাজী আছি ; নিচে নামতেও।

—তোমার একার ইচ্ছেই তো সমস্ত নয়।

—প্রদীপদা আসতে পারি ! প্রবীর এসেছে, দরজার বাইরে থেকেই ডাক্‌ছে ; অন্যদিন ভেতরে এসে পড়ে ; আজ শিখার আগমনেই বোধ হয় এই পরিবর্ত্তন।

—ভেতরে এসো।

—প্রদীপের আহ্বানে প্রবীর প্রবেশ করল। শিখা উঠে পড়ল তখনই ; সমস্যার সমাধান আজও হ'লো না।

শিখা চলে গেল।

শিখার চলে-যাওয়ার সঙ্গেই প্রদীপের সুসংবদ্ধ মনটা ভেঙ্গে গেছে ; তাই যতটা সম্ভব সামাজিকতা রক্ষা করে প্রবীরের কাছে প্রদীপ বিদায় চাইল। কাজে আর মন দিল না।

আট

সম্পাদক প্রদীপকে প্রায় সব সময়েই নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। অভ্যাগতদের সসম্মানে বিদায় করা তার মধ্যে একটা বড় কাজ। দৈনিক অভ্যাগতের সংখ্যার হিসাব রাখা হয় না তাই; রাখলে বেশ একটা মোটা অঙ্কই দাঁড়াত।

আজ যে অভ্যাগতের আগমন হয়েছে, যে অভ্যাগত এসেছেন, তিনি একজন ডাক্তার; এলোপ্যাথিক চিকিৎসা জগতে নবাগত। শুধু চিকিৎসা জগতেই নয় সাহিত্য জগতেও। এই নবাগত, নবাগত হয়েও চিকিৎসা ও সাহিত্য জগতে বেশ জেঁকে বসেছেন। মনের হয়তো একটা চোখ থাকে; কিন্তু আমাদের এই নবাগতের মনের দুটো চোখ আছে, আর এই দুটো চোখই সজীব; একটা চোখ যখন কাজ করে আর একটা চোখ তখন নির্লিপ্তভাবে চুপ করে থাকে হয়তো; কিন্তু আবার তার কাজ যখন শুরু হয়, তখন আর বোঝা যায় না যে, সে এতক্ষণ নির্লিপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে ছিল; মনে হয় জেগে জেগে সবই লক্ষ্য করে এসেছে; এ নির্লিপ্ততা শ্রীকৃষ্ণের কপট-নিদ্রার মতই কপটতা করে চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা অর্জন করে সাহিত্যে চালান দেবার ব্যবস্থা করেছে। এ ব্যবস্থায় এই নবাগতের সাহিত্য জগৎ বলিষ্ঠই হয়েছে; দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েনি।

প্রদীপ এতক্ষণ এই নবাগতের নামের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেনি; কারণ ছদ্ম নামে তিনি সাহিত্যে পরিচিত ছিলেন।

এই ছদ্ম নামের পেছনে যে আসল নাম নিহিত ছিল, তা এখন প্রকাশ পেল, নাম—শ্রীবিজয় সান্যাল।

নাম শুনে প্রদীপ নামের তারিফ করল আগে; বললে,—বিজয়, অর্জ্জুনের আর এক নাম। নামের সঙ্গে আপনার বেশ মিল আছে তো।

—কই আমিতো কোন মিল দেখছি না।

—আমি কিন্তু দেখছি।

—কি মিল দেখছেন?

—কেন মিল তো রয়েছে; বিজয় অর্থাৎ অর্জ্জুনের আর এক নাম সব্যসাচী। সব্যসাচী নামের পেছনে যে ইতিহাস আছে; তা হল এই যে, তাঁর দুটো হাতই কাজ করত, তাই তাঁর নাম হয়েছিল সব্যসাচী।

—আমার কিন্তু একটী হাত-ই কাজ করে।

—আমি তো দেখছি, দুটো হাত-ই কাজ করছে আপনার; একটা সাহিত্য, আর একটা ডাক্তারী।

—সেটা তো হাত নয়, মন।

—মনের কাজ হয় সবার আগে। কিন্তু হাতকে তো বাদ দেওয়া চলে না। মনের অন্তর্নিহিত ভাবধারা, শুধু ভাবধারা নয় কর্মধারা হাত-ই ফুটিয়ে তোলে।

—যাক্ ও কথা এখন আসল কথাতেই আসা যাক্।

—কোনটা আসল, আর কোনটা নকল তা আমার বোঝার ক্ষমতা এখনও হয়নি বিজয় বাবু।

—আসল কোনটাই নয়।

—সবই ক্ষণ-ভঙ্গুর, যে কথা সাড়া দেয় আজকের মনে, কাল হয়তো এর কোন দামই থাকবে না, আজকের যে কথা দোলা দেয়, কাল সে দোলা দেবে না ; এ ভাবে দোলা দেওয়ার ক্ষমতা তার লোপ পাবে। দাশরথির-পাঁচালী একদিন আমাদের মনকে শুধু দোলাই দেয়নি ; অন্তর দেশে বেশ প্রভাব বিস্তার-ই করেছিল। কিন্তু আজ তার প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা লোপ পেয়েছে ; শুধু প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতাই লোপ পায়নি, তা পাঠক সমাজে অবহেলিত হয়েছে। তার নামও আজ লোপ পেতে বসেছে। হায় এমনি হয়।

—ওর জন্যে আর দুঃখ করে কি হবে বিজয় বাবু ; যে সাহিত্য আজকের মানব-হৃদয়ে এক বলিষ্ঠ ঠাঁই করে নিয়েছে বলে মনে হয় ; কয়েক বছর পরে সে মানব হৃদয়কেই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঠাঁই করা তো দূরের কথা।

—তবে কি আমাদের সাহিত্য নিতান্তই ক্ষণ-ভঙ্গুর। এর কি কোন দামই নেই ?

—নিতান্ত ক্ষণ-ভঙ্গুর হতে পারে, তবে এর যে দাম নেই বল্‌ছেন, এ কথার কোন অর্থ হয় না। কারণ সাহিত্য আমাদের কৃষ্টি, আমাদের সমাজের দর্পণ। সাহিত্য যত উন্নত হবে, আমাদের সমাজ আর কৃষ্টি তত বেশী উন্নীত হবে।

—আচ্ছা প্রদীপ বাবু, আমাদের সাহিত্য সাধারণের উপযুক্ত

করে সৃষ্টি করা উচিত, না সাধারণের উচিত সাহিত্যের উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠা।

—কোনটা প্রকৃত উচিত তা আমি জানি না, তবে এ টুকুই বলতে পারি যে সাধারণের উচিত সাহিত্যের উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠা। সাহিত্য যেমনই হোক না, তা যদি সাধারণের বোধগম্য হয়ে না উঠে; তবে সাধারণেরই উচিত সাহিত্যকে বোঝার চেষ্টা করা। সাধারণের জন্যে তো সাহিত্য নিচে নামতে পারে না; সাহিত্যের জন্যে সাধারণকে উপরে উঠতে হবে!

—আমার লেখা প্রবন্ধ তো তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

—আমি তো পূর্বেই আপনাকে বলেছি, আমার 'প্রবাহে' আপনার আসন বরাবরের জন্যেই পাকা হয়ে রইল। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

—আজ তবে আসি প্রদীপ বাবু, একটা জরুরী কল আছে; আরও একদিন এসে আপনার সঙ্গে আরও আলাপ করব। আজকের দিনটা আমার সত্যিই ভাল গেল। নমস্কার।

বিজয় বাবু চলে গেলেন; প্রদীপ সেখানেই বসে রইল; ক-দিন 'প্রবাহে'র তাড়ায় শিখাকে সে প্রায় ভুলেই ছিল; আজ আবার শিখার কথা বড় বেশী করে মনে হতে লাগ্‌ল। মনের কি দোষ, সে যখনই সময় পায়, তখনই শিখার কথা মনে ক'রে নিরিবিলিতে একটু শান্তি খোঁজে। শান্তি তো পায় না, শিখার স্মৃতি মনে করে যন্ত্রণায় কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্ করে, কিন্তু তারই মধ্যে

কেমন যেন একটা তৃপ্তি পায়। সেই তৃপ্তিটুকুর লোভ সামলাতে না পেরেই কাজের ফাঁকে শিখাকে স্মরণ করে সে।

নয়

মিঃ গাঙ্গুলী এসেছেন; প্রদীপের সঙ্গে দেখা করতে; 'প্রবাহ' চলেছে তার পূর্ণগতি অটুট রেখে। ব্যবসায়ে মিঃ গাঙ্গুলীর লাভের অঙ্ক কম হয়নি; তাই তিনি প্রদীপকে কিছু অংশ দিয়ে পুরস্কৃত করতে এসেছেন।

পুরস্কারের কথা শুনে প্রদীপ বেশ খানিকটা হেসে নিল। পরে ধীরে ধীরে বল্‌লে,—আমার এখনও স্ত্রী-পুত্র হয়নি যে তাদের মুখ চেয়ে আমায় কিছু দয়ার দান-ই হোক, আর করুণার দান-ই হোক গ্রহণ করতে হবে। নিজের ইচ্ছা প্রায় সবই শেষ হয়ে গেছে, বয়স তো গড়িয়ে গেল বেশ খানিকটা, টাকা নিয়ে আর করব কি? আর তাছাড়া ও টাকা তো আমার প্রাপ্য নয়, আপনি ব্যবসা করেছেন, আমি চাকরি করে গেছি, আপনি লাভবান হয়েছেন, আরও একটা বাড়ী করুন, গাড়ী-বারান্দায় আরও দু-একটা আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয় পাবে।

মিঃ গাঙ্গুলীর মুখ বেশ খানিকটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল, এতখানা অপমান তিনি আশা করেন নি। কিন্তু অপমানিত হয়েও যে অপমানিত হয়েছেন, তা প্রকাশ করলেন না প্রদীপের

কাছে; মনে মনে বললেন,—ধনী হওয়া এ যুগে ঠিক হয়নি আমার।

মিঃ গাঙ্গুলীর নীরবতা চোখে পড়ল প্রদীপের, নিজের বলা কথাগুলো একবার বিশ্লেষণ করে নিল সে। তারও মুখ মিঃ গাঙ্গুলীর মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। পরকে আঘাত দেওয়া তার স্বভাব নয়, কিন্তু স্বার্থপর পৃথিবীর স্বরূপ দেখে মনটা বারবার বিষিয়ে উঠে প্রদীপের, তাইতো তা মাঝে মাঝে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগীরণের মত কথার টানে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে।

—আমায় ক্ষমা করুন মিঃ গাঙ্গুলী; ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য বড় চোখে লাগে, দারিদ্রের দিকে তাকিয়ে নিজেদের বড় অপমানিত বোধ করি, ধনীর ঘৃণা আর দাম্ভিকতা বার বার আমাদের অবচেতন মনকে জাগিয়ে তোলে, প্রতিবাদ করতে শেখায়। বলে,—অপমান শুধু কি সহেই যাবে, প্রতিবাদ করতে পারবে না কোনদিন? তাদের দয়া পেয়ে তোমরা ধন্য মনে করে কৃতার্থের গর্বে ভরে উঠবে। ধিক্ তোমাদের! তাইতো নিজেকে চেপে রাখতে পারি না মিঃ গাঙ্গুলী, এক একবার জ্বলন্ত ধূমকেতুর মত এই দারিদ্রের অপমান থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু যাব কোথা, দারিদ্রের লৌহকারাতে আমরা বন্দী, মনে হয় যাবজ্জীবনের জন্যে, তা ভাঙ্গার ক্ষমতা আমাদের নেই, বাসনা ঠিকই আছে। কিন্তু বাসনা দিয়ে কোন কাজই হয় না; হয় যদি সে বাসনা দৃঢ় হয়ে থাকে। হায় আমাদের এ বাসনা মোটেই দৃঢ় নয়, কারণ আমাদের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে গেছে।

এক ভাগ এই দারিদ্রকেই মেনে নিয়েছে, আর এক ভাগ আছে, যারা মেনে নেয়নি, তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এমন শক্তি তাদের নেই যে তা ঘাড় থেকে তারা সরিয়ে ফেলে।

— সবই বুঝি, কিন্তু আমায় বার বার অপমান করছেন কেন প্রদীপ বাবু?

—কেন তা তো আপনি জানেন, আমাদের কাছে যে আপনি ধনীর রিপ্রেজেন্‌টেটিভ ; ধনীদের নাগাল পাইনে যে ধরে মনের জ্বালা খানিকটা মিটিয়ে নেব,—এই সব বলে।

— যাক্ ও কথা, আপনার অনুযোগ মাথা পেতে নিলুম, কিন্তু ক্ষমা করলুম না, কারণ তার উপযুক্ত ক্ষমতা আমার নেই, শুধু এ ক্ষমতা নয়, আপনার কথার দোষ গুণ বিচার করার যোগ্যতাও আমার নেই।

—অত বিনয়ী হবেন না, মিঃ গাঙ্গুলী।

— না হয়ে তো উপায় নেই।

—কে বল্‌লে নেই?

—আছে উপায়?

—হাঁ আছে।

—যাক উপায় পরে শুনবো, এখন আমার এ টাকাটার একটা ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতে হবে। আচ্ছা লেখকদের মধ্যে ভাগ করে দিলে কেমন হয়?

—ভিক্ষার দান তারা যদি গ্রহণ না করে।

—ভিক্ষা কেন প্রদীপ বাবু, তাঁদের সম্মানের পুরস্কার।

—দান করার বেশ নতুন পথ আবিষ্কার করেছেন মিঃ গাঙ্গুলী।

—দান করার নয়।

—তবে কি ভিক্ষে দেওয়ার।

— ক্ষমা করুন প্রদীপ বাবু, শিল্পীকে ভিক্ষে দিতে যাব কোন ভরসায়। তাঁদের একনিষ্ঠ সাধনায় যা পাওয়া গেছে তা আমি একা ভোগ করতে পারব না প্রদীপবাবু। আসুন না 'প্রবাহে'র সুখ, দুঃখের ভার আমরা সবাই মিলে নিই। 'প্রবাহ' আজ থেকে সকলের সম্পত্তিতে পরিণত হোক। এর বিস্তার সকলের বিস্তার হোক ;—এ বিস্তার অর্থ-নীতিরই হোক, আর প্রতিষ্ঠারই হোক।

—আপনাকে অভিনন্দন দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না মিঃ গাঙ্গুলী। জানি না এত উঁচুতে আপনি কেমন করে গিয়ে পৌঁছেছেন।

ঠিক এমনই এক শুভ মুহূর্ত্তে শিখা এসে পড়েছে, 'প্রবাহে'র প্রকাশালয়ে।

শিখার দিকে তাকিয়ে প্রদীপের আর পূর্বের মত ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি তো ফুটে উঠল না, কেমন যেন একটা দ্বিধা এসে শিখা আর প্রদীপের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করে দিয়েছে।

শিখাকে আসতে দেখে মিঃ গাঙ্গুলী সেদিনের আলোচনা শেষ করে বিদায় নিলেন।

শিখাকে বসতে বলা হয়নি ; নাই-বা হ'ল, প্রদীপের তাতে স্পৃহা ছিল না। যে প্রেমের কোন কাঠামো নেই, যে প্রেমের কোন ভিত্তি নেই, সে প্রেমকে আর আঁকড়ে থাকতে চাইল না প্রদীপ, কারণ প্রদীপ জানে শিখার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে এই ক্ষণ-ভঙ্গুর প্রেমকে আর জিইয়ে রাখার কোন অর্থই হয় না। এ প্রেমের কোন ভাল পরিণতি নেই, শিখারও মোহ কেটে গেলে এ প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা তার কমে যাবে। প্রদীপও তার কাছে ছোট হয়ে যাবে। প্রদীপের মন আজ বিদ্রোহী হয়ে উঠল, শিখাকে সে ফিরিয়ে দিতে চাইল, কিন্তু শিখার কোমল মনের গোপন পরিচয় মনে পড়ায় তা তখনই করে উঠতে কুণ্ঠিত হ'ল সে।

নীরবতা ভেঙ্গে এই প্রথম কথা কইল প্রদীপ,—সেদিনের অসমাপ্ত সমস্যা আজও অসমাপ্ত থাকবে শিখা, কারণ আমি আর ও সমস্যার সমাধান চাই না।

—চাও না! বেশ দমে গেল শিখা ; মনে হল বিরাট ভূমিকম্পে পায়ের নীচেকার মাটী তার সরে গেছে, পৃথিবীটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে ; সে একা, একটা আশ্রয়, একটা অবলম্বনও তার নেই।...শিখার মাথা ঘুরছে, এখুনি পড়ে যাবে সে। কেউ নেই তার এ অবস্থায় তাকে সাহায্য করে। প্রদীপ আজ নিভে গেছে, শিখার আজ আর কোন দাম নেই ; বাগানের অবহেলিত বাসিফুলের মত আজ তাকে ধূলি-ধূসর মাটিতে ফেলে দিয়েছে প্রদীপ।

শিখার বুকের ভেতরটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে, অসহ্য যন্ত্রণা।

···যাক্ সামলে নিয়েছে সে।

—আসি প্রদীপ দা,—বিদায় চাইল শিখা।

—এসো!

শিখা চলে গেল। আঘাত এত বড় হয়ে দেখা দেবে, প্রদীপ তা কল্পনা করতেও পারেনি। ভয়-বিহ্বল অন্তরে প্রদীপ ঈশ্বরকে স্মরণ করল সেদিন।

দশ

গৃহে ফিরে এলো শিখা।

—কোথায় গিয়েছিলে?—সূর্য্যকান্ত প্রশ্ন করলেন।

—প্রদীপ দার কাছে। উত্তর দিল সে।

সূর্য্যকান্তের অন্তর আকাশে জ্বলে উঠল লোলুপ চিতাগ্নি। ঊর্দ্ধে দেখা দিল রক্তাভ বৈশাখী ধ্বজা, মেঘ রন্ধ্রচ্যুত তপনের জল-দর্চ্চি-রেখায়।

শিখা পিতাকে গ্রাহ্য করল না, নিজের ঘরে এসে সজোরে দরজা বন্ধ করে দিল,—সামনেই ছিল তার মায়ের অয়েল পেন্টিং ছবি,—বলে চল্‌ল শিখা—

—মা আমার জীবনের পরিণাম কি? পরিসমাপ্তি

কোথায় ? মা তুমি তো চিরমঙ্গলময়ী, এই ঘোর অমঙ্গলের মধ্যে তুমি আমায় মঙ্গল দাও, অভয় দাও। তুমি কি স্বর্গ থেকে আমার মঙ্গল কামনা করতে পার না। প্রদীপদাকে ভালবেসেছি, বিশ্বাস করেছি, তার আশ্রয়কে জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনার ধন বলে জেনেছি। জানি না, আজ আমি প্রতিহত হলাম কেন ? মা তুমি যদি আজ বেঁচে থাক্‌তে, আমার মনের সমস্ত দ্বন্দ্ব তবে মিটে যেত। বল্‌তে পার মা প্রদীপদা আজ এতো কঠোর হ'ল কেন ? তার ভেতরের হৃদয়টা কি পুড়ে পুড়ে খাঁটি ইস্পাত হ'য়ে গেছে ? যদি হয়ে থাকে, তবে আমি কি করব ? কোন পথে চল্‌ব বলে দাও!

মা তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর, আমি যাকে ভালবেসিছি, তারই জন্যে যেন চিরকাল প্রতীক্ষা করে থাকতে পারি। আমার সমস্ত দেহ মন যে তাকেই কেন্দ্র করে পল্লবিত হয়ে উঠেছে। যাকে ভালবাসি তাকে না পেয়ে অন্য কাউকে বরণ করতে আমি পারব না। মা আমি যে আর চিন্তা করতে পারছি না, কল্পনাও করতে পারছি না, আমার পরিণতির কথা।

—দরজা খোল শিখা। সূর্যকান্ত অধৈর্য্য হয়ে পড়েছেন, শিখার ব্যবহারে তিনি স্তম্ভিত হয়েছেন।

শিখা দরজা খোলে নি, তাই তিনি চীৎকার করে আবার বলে উঠলেন—শিখা ছেলে-মানুষি রাখ, দরজা খুলে আমার কথাগুলো ভাল করে শুনে রাখ,—শিখা!

শিখা নির্ব্বাক, অন্তরের আবেদন আপনার বিশ্বাসের বেদী-

মূলে অর্পণ করে চলেছে সে; শিখার বিশ্বাস—তার আবেদন ঠিক মায়ের অন্তর দুয়ারে গিয়ে বেজে উঠছে। মা তার আকুল ক্রন্দন লক্ষ্য করে চলেছেন। সাড়াও দেবেন। শিখা এখন একা, তার আকুল হৃদয়ের ব্যাকুল কাকুতি শোনার একমাত্র অধিকারিণী তার মা, মাকে সে শ্রদ্ধা করেছিল। হৃদয়ের গোপন ভক্তি-অঞ্জলি দিয়ে সে মৃত-মাকে পূজা করে এসেছিল,—জীবিত মায়ের কল্পিত মূর্ত্তিতে। স্বপ্নের কল্পিত বেদীমূলে সে মায়ের আসন অপূর্ণ রাখেনি। মা এসে তার ব্যাকুল আহ্বানে সাড়া দিতেন। শিখাকে তার কর্ত্তব্যের কঠিন সংগ্রামে প্রস্তুত হ'তে শিক্ষা দিতেন। ত্যাগ ও তিতিক্ষা দু-ব্রতেই তাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করতেন তার মা।: তাইতো শিখা তার নিজের সমস্ত কথা, ব্যথাভরা হৃদয়ের সমস্ত কাহিনী ব্যক্ত করে চলে মায়ের কল্পিত হৃদয়াসনে!

শিখা এখনও দরজা খুলবে না?

শিখার কেমন একটা ঘৃণা জন্মেছিল, সূর্য্যকান্তের উপর। দরজা ভেতর থেকে চেপে ধরে, আকুল হৃদয়ে মায়েয় কাছে আবেদন করে চলল সে। নির্ব্বাক তৈলচিত্র কোন সাড়াই দিল না।

—শিখা। আবার সূর্য্যকান্তের বজ্রগম্ভীর আহ্বান।

অচঞ্চল শিখা এখনও অচঞ্চল।

দরজায় বার বার আঘাত পড়ে সূর্য্যকান্তের।

দুর্বল শিখা সমস্ত শক্তি দিয়ে পিতার শক্তি প্রতিহত করতে

চাইল। বিদ্রোহী সে, প্রণয়ের তীব্র মদিরায় সে পিতার বিদ্রোহী। তার আশার তরণী নদীর অকুল জোয়ারে ডুবিয়ে দেওয়ায় সে সূর্য্যকান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী।

তার সমস্ত বিদ্রোহী ভাব, এতদিন যা প্রকাশ পায়নি, আজ তা প্রকাশ পেল, তারই অপ্রকাশ্যে।

সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে আঘাত হানলেন পিতা।

দুর্বল আক্রোশে তা প্রতিহত করতে চাইল পুত্রী।

লৌহ শলাকা বসান বিরাট দরজা সজোরে খুলে গেল তখনই। সূর্য্যকান্ত জয়ী হলেন।

আঘাত পেয়ে ভূলুণ্ঠিত হ'ল শিখা।

অস্ফুট আর্ত্তনাদ বেরিয়ে এলো—উঃ।

হিংস্র-ব্যাঘ্রের মত সূর্য্যকান্ত প্রবেশ করলেন ঘরে, আঘাত কত বড় লক্ষ্য করলেন একবার। পরে বহ্নির খোঁজে বেরিয়ে গেলেন তখনই। তাঁর বলা হল না কিছুই।

শিখার আঘাত বড় হয়নি ততো, যত বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল পিতার প্রতিঘাত।

এগার

শিখা শুয়ে আছে খাটে, পাশে বসে আছে বড় বোন বহ্নি।

শিখার শরীর দুর্ব্বল, বেশী কথা সে কইতে পারছে না, তবুও বলে চলেছে,—বহ্নির সঙ্গে তার তর্কের মীমাংসা হয় না। প্রদীপের কোন সংবাদই সে বহ্নির কাছে ব্যক্ত করছে না, বহ্নির অনুরোধও সে এড়িয়ে যাচ্ছে। প্রদীপের কথা ছেড়ে তার নিজের কয়েকটা কথা আজ বড় হয়ে প্রশ্নের আকারে দেখা দিয়েছে তার মনে, তাই সেগুলোর উত্তর চাই আগে, তাইতো প্রশ্ন করল শিখা,—মেয়েরা পর্দ্দানসীন কেন ?

—"তুই কোন পর্দ্দার কথা বল্‌ছিস। যে কৃত্রিম পর্দ্দা দিয়ে কৃপণ পুরুষ মেয়েদের অদৃশ্য করে লুকিয়ে রাখে সেই বর্ব্বর পর্দ্দা, না নিজেকে যে সহজ পটুত্বের আভরণে মেয়েরা নিজেদের লুকিয়ে রেখেছে সেই পর্দ্দার কথা বলছিস্ ?"

—"আমি বলছি সেই পর্দ্দার কথা, যে পর্দ্দা দিয়ে মেয়েরা নিজের দেহকে, গৃহকে, আচরণকে, মনকে নানা বর্ণ দিয়ে, ভঙ্গী দিয়ে, সংযম দিয়ে, অনুষ্ঠান দিয়ে নিজের বিচিত্র একটা বেষ্টনকে তারা সুসজ্জিত করতে পেরেছে, আমি বলছি সেই বেষ্টনের কথা, সেই সুসজ্জিত পর্দ্দার কথা।"

এ সার্ব্বজনীন প্রশ্ন একা শিখার নয়! বহ্নিও তাই, কয়েকজন মনিষীর কথায় শিখার এ প্রশ্নের জবাব দিল,—

—"কারণ মেয়েরা স্থিতির সন্ধান পেয়েছে। স্থিতির মূল্যই হচ্ছে তার আবরণের ঐশ্বর্য্যে, তার চারিদিকের দাক্ষিণ্যে, তার আভাসে, ব্যঞ্জনায়, তার হাতে যে সময় আছে, সেই সময়টার মনোহর বৈচিত্র্যে। তুই তো জানিস, সবুরে মেওয়া ফলে, কারণ মেওয়া যে প্রাণের জিনিষ, আধুনিক কালের তাড়ায় তাকে তাড়া-হুড়ো করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সেই দামী সবুরটা হচ্ছে স্থিতির আপন ঘরের জিনিষ। এই বহু মূল্য সবুরটাকে যদি সরস, সুন্দর ও সফল করতে না পারা গেল, তবে তার মতো আপদ আর দ্বিতীয় নেই। মরুভূমি অনাবৃত, তার অবকাশের অভাব নেই অথচ সেই অবকাশ রিক্ত, কঠিন নগ্নতা পীড়া দেয়। কিন্তু যেখানে পোড় জমি পোড় হ'য়ে নেই ; সেখানে সে ফসলে ঢাকা, ফুলে বিচিত্র, সেখানে তার সবুজ ওড়না বাতাসে দুলে দুলে উঠছে। যে পথিক সে পথে চলে সেখানেই সে পায় তার তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার অন্ন, তার আরামের ছায়া, ক্লান্তির শুশ্রূষা। সেখানকার স্থিতির পূর্ণতাই তার গতির সহায় ; অবারিত মরুভূমি-ই সব চেয়ে বাধা। নারী স্বভাবতই যে স্থিতি পেয়েছে, ব'সে ব'সে ধীরে ধীরে সেই স্থিতিকে রাঙিয়ে তুলে' আপন হৃদয় রসে রসিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে আপন বুকের কাঁচলি, আপন মুখের ঘোমটা বানিয়েছে। এই ঢাকাতেই সে আপনার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেছে, এই পর্দ্দাতেই সে আপন মহিমা বিস্তার করেছে, পুষ্প-পল্লবের আবরণেই যেমন লতার ঐশ্বর্য্য !"

—আচ্ছা দিদি, এই আবরণ তো ভালই ছিল, তবে আধুনিক

সমাজের নারী বলছে কেন ?—"আমি এ মায়ার আবরণ ছিন্ন করে, পুরুষের সঙ্গে ব্যবধান ঘুচিয়ে দেব।"

—"একদল মেয়ে যে এ কথা বল্‌ছে না তা নয়, এর কারণ পুরুষের প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন এসেছে। মেয়েকে সে ঠিক আর পূর্ব্বের মত চাচ্ছে না। এমন নয় যে সে হঠাৎ সন্ন্যাসী হ'য়ে উঠেছে—বরং ঠিক তার উল্টো। সে হয়েছে বিষয়ী, মেয়েকে সে কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিতে চায়, কড়ায় গণ্ডায় যার হিসাব মেলে না তাকে সে মনে করে বাজে জিনিষ, তাকে সে মনে করে ঠকা। সে বলে,—আমি চোখ খুলে তন্ন তন্ন করে দেখব, অর্থাৎ ধ্যানেব দেখায় যা মনকে ভরিয়ে তোলে সেটাকে সে জানে ফাঁকি। কিন্তু পুরুষের রাজ্যে সত্যকার মেয়ে তো কেবলমাত্র চোখে দেখার জিনিষ নয়, সে তো ধ্যানের জিনিষ, অন্তর দিয়ে অনুভব করার। সে যে শরীরী অশরীরী দু'য়ে মিলিয়ে ;পৃথিবী যেমন নিজের মাটি ধূলো আর নিজের চারদিকের অসীম আকাশ ও বায়ুমণ্ডল মিলিয়ে। মেয়ের যা অশরীরী তা যে শরীরী মেয়েকে ঘিরে আছে, তার ওজন নেই কিন্তু তার বর্ণ আছে, ভঙ্গী আছে, তা ঢাকে, অথচ তা প্রকাশ করে। পাশ্চাত্য সভ্যতায়, আধুনিক প্রগতিকে পুরুষ পাল্টে গেছে, এ পাল্টানো, একেবারে থেমে যাওয়া নয় চলা,—যেমন গাড়ীটার ঘোড়াও চল্‌ছে, সারথিও চল্‌ছে, যাত্রীরাও চল্‌ছে, গাড়ীর জোড় খুলে গিয়ে তার অংশ প্রত্যংশগুলোও চল্‌ছে, একে তো চলা বলে না, এ হচ্ছে মরণোন্মুখ চলার উন্মত্ত প্রলাপ, সাংঘাতিক

থামার ভূমিকা। আজ মেয়েদের যে কথা প্রকাশ পাচ্ছে তা প্রকাশ পাবেই,—মেয়েরা সমাজের চলাকেই স্থিতির ছন্দ দেয়। সে যে সুন্দর।"

বহ্নির বলা উত্তরগুলো আর বিরোধী রূপ নিচ্ছে না শিখার মনে, বরং বহ্নির শাস্ত মীমাংসা সমর্থন করে চলেছে সে, শিখার যতগুলো প্রশ্ন মনের দ্বারে ভিড় করেছিল, তার প্রায় সবের উত্তর মিলেছে, প্রশ্নের মীমাংসা হয়েছে। এখনও একটা প্রশ্ন শিখার অন্তরে দোলা দিচ্ছিল, সেটা সে ব্যক্ত করল এবার,—একদল বলতে শুরু করেছে যে—"মেয়ে হওয়াতে আমাদের অগৌরব, আমাদের ক্ষতি, অর্থাৎ আমাদের প্রকাশের পথে পুরুষের সঙ্গে প্রভেদটাতে পীড়া পাচ্ছি।"

—"এর থেকে মনে হচ্চে একদিন যে পুরুষ ছিল সাধক, এখন সে হয়েছে বণিক। বণিক বাহিরের দিকে যদি বা চলে অন্তরের দিকে আপনার সঞ্চয়ের বোঝার কাছে সতর্ক হয়ে পড়ে সে। তার স্থিতি সারবান্, কিন্তু সুন্দর নয়। তার কারণ মানুষের সম্বন্ধকে হৃদয় মাধুর্য্যে সত্য করে পূর্ণ করে তোলা তার স্থিতির ধর্ম্ম নয়। ধন-সঞ্চয়ের তলায় মানুষের সম্বন্ধকে চাপা দিয়ে চ্যাপ্‌টা করে দেওয়াই হয়েছে তার কাজ। সুতরাং সে যে কেবল চলে তা নয়, আপন স্থিতিকে ভারগ্রস্ত নীরস নির্ম্মম অসুন্দর করে। অঙ্কের কোঠার মধ্যে যাকে ধরে না, তাকে সে আবর্জ্জনার মধ্যে ফেলে দেয়।"

—"তবে তুমি কি বলতে চাও, যে পুরুষ একদিন ছিল

Mystic, ছিল অতল রসের ডুবারি, সে এখন হয়েছে মেয়েদের মতই সংসারী ?"

—"হাঁ ঠিক তাই, তবে প্রভেদ আছে যথেষ্ট।"

—"কি প্রভেদ ?"

—"প্রভেদ এই যে তার সংসারে আলো নেই, বাতাস নেই, আকাশ নেই, বস্তু পিণ্ডে সমস্ত নিরেট।"

শিখা বহ্নির সমস্ত কথা সমর্থন করল ; মনে মনে দুঃখ করে বললে,—ওগো পুরুষ, তোমরা বিশ্ব-প্রকৃতির স্রষ্টা হ'য়ে সৃষ্টিকে চিন্‌তে পারলে না ; তোমাদের দেখে দুঃখ হয়, তোমরা আপন কাব্যকে, শিল্পকে, আপন কারুর অনির্ব্বচনীয় সুন্দরকে অবজ্ঞা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছ। আরও দুঃখ হয়, এই জন্যে যে তোমরা তো চিরকাল সুন্দরের কাছ থেকে আপন শক্তির জয়মাল্য জিনে নিয়েছ। তবে আজকে এ দশা কেন ? তোমাদের দিকে তাকিয়ে মেয়েরা বল্‌ছে—"আমরা পুরুষ সাজব, তাই তার কাব্য-সরস্বতী বল্‌ছে—বীণার তারগুলোকে যত্ন করে না বাঁধলে যে সুরটা ঝন্ ঝন্ করতে থাকে সেইটেই খাঁটি বাস্তবের সুর, উপেক্ষার উচ্ছৃঙ্খল দুরন্তপনায় রূপের মধ্যে যে বিপর্য্যয়, যে ছিন্ন ভিন্নতা ঘটে, সেইটেই আর্ট।"...

—শিখা তুই কি তোর বিশ্লেষণ দিয়ে তোর প্রদীপদাকে বিচার করে চলেছিস ? না সাধারণের সঙ্গে পার্থক্যটা লক্ষ্য করছিস !

—কোনটাই নয় দিদি, প্রদীপদাকে ছাড়িয়ে আমার চিন্তার ঢেউ গিয়ে পড়েছে সমস্ত পুরুষ জাতটার উপর।

—তোর প্রদীপদাও ওই পুরুষ জাতটার মধ্যে পড়ে।

—জাতি ভেদ প্রথা যতই তুলে দিতে চাই আমরা, কিন্তু জাতি ভেদ ঠিকই আছে, থাকবেও। এই পুরুষেরও দুটো জাত আছে, একটা উন্নত, আর একটা অবনমিত ; সাধারণকে অবনমিত, আর অসাধারণকে উন্নত জাতের মধ্যে ফেলা চলে, তোমার আধুনিক পুরুষ-বিশ্লেষণের মধ্যে উন্নত জাত পড়ে না, তাকে একটা বিশেষ জায়গায়, বিশেষ পরিধির মধ্যে রেখে বিচার করতে হয়। অবনমিত জাতের আধুনিক বিচারক দিয়ে তার বিচার হবে না, উন্নত জাতের আধ্যাত্মলোকে তার ভূমার পরিচয় পাওয়া যাবে !

প্রদীপের প্রতি শিখার শ্রদ্ধা দেখে বহ্নি স্তম্ভিত হ'ল খানিকটা। পরে মুখ টিপে একবার হেসে বললে,—আমার ঘাট হয়েছে শিখা, যারা কেবল থলির পর থলির মুখ বাঁধছে ; সিন্ধুকের পর সিন্ধুকে তালা লাগাচ্ছে, তাদের দলে আর তোর প্রদীপদাকে টান্‌ব না ভাই ! তোর শরীর দুর্ব্বল তুই একটু বিশ্রাম নে এখন। বেলা গড়িয়ে গেল বেশ খানিকটা।

বহ্নি সেদিনের আলোচনায় ছেদ টানল, শিখার কাছে নিজের দোষ শিকার করে।

শিখাও বহ্নিকে বিদায় দিয়ে আর এক চিন্তার আশ্রয় নিল তখনই। সে চিন্তা একান্ত নিজের, বহ্নির প্রয়োজন সেখানে একান্তই কম।

বার

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর আজ সকাল থেকেই বাদলা হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে, রাত্রে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেছে। আকাশে ছন্নছাড়া মেঘের দল এলোমেলো চলে বেড়াতে শুরু করেছে। ঝির-ঝিরে বৃষ্টি মাঝে মাঝে খুঁৎখুতে ছেলের মত কেঁদে কেঁদে উঠছে। আকাশের ফাঁক থেকে ক্ষণে ক্ষণে রোদও উঁকি মারছে, যেন তার লৌহ গারদের গরাদের ভেতর থেকে। সূর্য্যের উপর বাদলার আক্রোশ বেড়ে গেছে, মেঘের দল কালো উর্দ্দিপরে সূর্য্যের চারদিকে যেন টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, আবহাওয়া দেখে মনে হয় যেন অনেকদিন পর অনেক পরিশ্রমে মেঘের কারাগারে সূর্য্য বন্দী হয়েছে, আজ এ আচ্ছন্ন সূর্য্যের আলোয় প্রদীপের চৈতন্যের স্রোতস্বিনীতে যেন ভাঁটা পড়ে গেছে। জোয়ারের প্রতীক্ষায় বসে থেকেও আজ আর জোয়ার আস্‌ছে না।

তবুও উপায় নেই খাতা কলম নিয়ে বসতেই হবে, বসেও ছিল। নীরস সম্পাদকীয় লিখতে খানিকটা। প্রবীর এসেছিল সকালেই। বাদলা হাওয়ায় সেও জমে গিয়েছিল প্রদীপের ঘরে, তবে বেশী কথা বলার উপায় তার ছিল না। কথাও বেশী বলেনি সে। চুপ করে ঘণ্টা তুই বসে, সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন মুখস্ত করছিল, এবার তারও পরিসমাপ্তি এসেছে। আর ভাল লাগছিল না, এ ঝির্‌-ঝিরে বর্ষায় একা একা মুখ গোমরা ক'রে

বসে থাকতে। এবার বিজ্ঞাপন দেখা শেষ হলে, উঠি উঠি করে উঠে পড়ল সে।

প্রদীপের এতক্ষণ পরে চমক ভাংলো, নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়ে সে খাতা বন্ধ করল। পরে দেখা গেল কোন আলোচনাই বেশী দূর গড়াচ্ছে না। অগত্যা সম্পাদকীয় পাঠ করে শোনানই সাব্যস্ত হ'ল, প্রদীপ পড়তে শুরু করে দিল,—"বুনো হাতী সতিই ভীষণ, বজ্রবৃংহতি ঝড়ের মেঘের মতো। দুর্ব্বল মানুষ বল্লে তার পিঠে চড়বে। এ বলা আজ নয়, আজ থেকে বহু বর্ষ আগেকার বলা, তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচলন হয়নি এদেশে। তখন বর্শা হাতে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত মানুষ শিকারের খোঁজে, তখন তাদের পরিচয় ছিল তারা শিকারী। এই শিকারী, এই প্রকাণ্ড দুর্দ্দাম প্রাণ পিণ্ডটাকে গাঁ গাঁ করে শুঁড় তুলে আস্‌তে দেখেও এমন অসম্ভব প্রায় কথা উচ্চারণ করেছিল। তার পরে পিঠে চড়ব বলা থেকে আরম্ভ করে পিঠে চড়ে বসা পর্য্যন্ত যে ইতিহাস সেটাও একটা অদ্ভুত।" অনেক-দিন পর্য্যন্ত কিন্তু এই অসম্ভব সম্ভবের কাছ ঘেসেও আসতে পারেনি, তারপর এমন দিন এলো যখন মানুষ তার পিঠে চড়ে ফসল ক্ষেতের ধারে, লোকালয়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। শিকারী জয়ী হল। তখনকার পৃথিবী ছিল এখনকার তুলনায় আরও পিছনে, এটা বিজ্ঞানের যুগ, সে যুগ ছিল তপস্যার যুগ, তখনকার মানুষ আকাশে উড়াকে মানবতা বিকাশের, তার চাওয়ার পরম তৃপ্তি বলে মনে করত। তাই তার তপস্যা ছিল

আকাশে উড়ার। মানুষের বিজ্ঞান বুদ্ধির, আর তার সাহসের মৃত্যুজয়কারী তপস্যা যখন মিল খেল, তখন তার তপসিদ্ধির পথে ইন্দ্রদেবের বাধা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

বর্ত্তমান যুগের আধুনিক বিজ্ঞানের বাহ্য রূপ দেখে গা-হাত শির শির করে, আরও যখন চোখে পড়ে তার বাহ্য নির্লজ্জতা। "ঠিক যেন পাক-যন্ত্রটা দেহের বাইরে এসে তার জটিল অন্ত্র তন্ত্র দেখাতে ব্যস্ত। তার ক্ষুধার দাবী তার নিপুণ পাক প্রণালীর বড়াইটাই সর্ব্বাঙ্গীন দেহের সম্পূর্ণ সৌষ্ঠবের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে।" মানুষের দেহ যখন আপন মাধুরিমা প্রকাশ করতে চায়, তখন সে আপন সুষমার দ্বারাই করে। যখন সে আপন ক্ষুধাকেই বড় একান্ত করে তোলে তখন বীভৎস হতে তার লজ্জা নেই। রিপুর নির্লজ্জতাই বর্ব্বরতার প্রধান লক্ষণ।

আজ শক্তির সাধনা বিজ্ঞানের সাধনায় রূপান্তরিত হয়েছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা তার মদগর্বে এতদিন অনেক কিছু সমস্যা অবহেলা করে এসেছে, কিন্তু আজ, আজ এ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পৃথিবীর কাছে একটা আতঙ্ক। এ আতঙ্কের কারণ পৃথিবী আজ এই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পেছনের ছেঁদাটা আবিষ্কার করেছে। ভগবানের দান মানুষ গ্রহণ করেছে ঠিকই, কিন্তু ব্যবহার শেখেনি, তাইতো আজ বিজ্ঞানের ব্যবহার পৃথিবীর আতঙ্ক জাগাচ্ছে। "তাইতো বহু চর্চার পর নিজের ঘরে যে ফল ফল্‌ল, তা নিয়ে এখন এরা উদ্বিগ্ন। তৃণে এরা আগুন লাগাচ্ছিল এখন এ আগুন লেগেছে তার নিজের বনস্পতিতে।" সে

থামবে কোথায়? থামাই কি শ্রেয়? না ঠিক তা নয়। লোভের সাধনা এড়িয়ে ধর্ম আর বিজ্ঞানের সাধনা এক করে দিতে হবে। "বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গে ধর্ম মিলনের অপেক্ষায় আছে, এই মিলনে হবে সিদ্ধি!"

এতক্ষণ পরে প্রকৃতির মনে পরিবর্ত্তন এসেছে, ঝাঁকড়া ঝুটি-ওয়ালা বর্ষা এক ভবঘুরে বেদের মত তার কালো মেঘের তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে আবার অজানা দেশে পাড়ী জমাতে শুরু করেছে, আকাশে নীলপদ্মের দোলা লাগছে।

প্রদীপ এতক্ষণে সম্পাদকীয় পড়া শেষ করে উঠে পড়েছে। প্রবীরও তাই, সেও উঠে পড়ল এবার, যে সম্পাদকীয় সে একান্ত নীরস ভেবে, শোনার প্রস্তাবে ঘাড় নেড়েছিল বটে, তবে সে ঘাড়-নাড়া ভেতর থেকে নয়, প্রদীপের প্রস্তাবে সাড়া দেওয়া, এভাবে সাড়া দেওয়া তার যেন স্বভাব হয়ে গেছে, তার যে নিজের কোন অস্তিত্ব নেই, থাকলে কি আর তা প্রকাশ না পেত। যাক সে কথা, যে নীরস সম্পাদকীয় শোনার প্রস্তাবে সে আতঙ্কিত হয়েছিল, তা এখন সুন্দর সরস হয়ে তার প্রাণে দোলা দিয়েছে। তাইতো তা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও সে বসেছিল, বসেছিল আরও কিছু শোনার আশায়, কিন্তু পিছু টান ছিল তার, পিছু টান রেখে কোন কাজ সুসম্পন্ন হয় না, কারণ মনের যে একটা গতি আছে, তা বার বার ব্যাহত হয়, হোক ব্যাহত প্রবীর আজ মনের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছিল, এ দাঁড়ান তার ভাললাগা থেকেই এসেছিল।

বাদলা অনেকক্ষণ কেটে গেছে, আবার গ্রীষ্ম তার নগ্ন রূপ প্রকাশ করেছে। প্রদীপ আর প্রবীর উভয়েই এখন বার মুখো হয়েছে, বহুক্ষণ গুমট আবহাওয়ায় বদ্ধ ঘরে তারা বর্ষায় ঘরে বসে থাকার বিরসতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, এখন একটু বিশ্রাম চাই, শ্রান্ত তারা Recreation খুঁজছে। যুদ্ধের পর মানুষ যেমন ঝিমিয়ে পড়ে, শক্তি কমে যায় খানিকটা। এরাও ঠিক তেমনি, নিঝুম হয়ে পড়েছে, বাইরে মুক্ত প্রকৃতির নির্মল তরতরে হাওয়ায় যদি তার পরিবর্ত্তন আসে খানিকটা, এই আশায় তারা বেরিয়ে পড়ল পথে; প্রবীরের সম্পাদকীয় ভাললাগা বন্ধ রাখতে হল !

তের

রাত্রির কেমন একটী মাদকতা আছে, অন্ধকারের একটা রূপ আছে, এ রূপ আলোর রূপের চেয়ে বহু অংশে সুন্দর। মানব-মন যখন অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত হয়, তখন সে অন্ধকারের রূপ প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়, অন্ধকার গহ্বরে তো আলোর রেখার প্রবেশাধিকার থাকে না, সেখানে অন্ধকারের কারবার।

বহ্নি এখন রাত্রির অন্ধকার কক্ষ গহ্বরে নিমজ্জিতা। তার মন রাত্রের অন্ধকারে আপন সত্বার পরিচয় পেয়েছে। বহ্নির জীবনব্যাপী এখন এক অন্ধকারের যুগ, আলোর যুগ সেই কবে

তার শেষ হ'য়ে গেছে, যখন মনোজের ভালবাসা তার হৃদয় আকাশে জ্যোৎস্নার বন্যা এনেছিল তখন, হায় সে আজ অনেক দিনের কথা, মনোজের ভাললাগা তাকে কাছে টানেনি, দূরে ঠেলে দিয়েছে, সুইচ্ অফ্ করা অন্ধকার ঘরে বহ্নি আজ রূপের অপরূপ ছন্দ লহরি মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব করে চলেছে। মনে পড়েছে তার সে দিনের কথা, যেদিন মনোজ তার হাতে হাত রেখে বলেছিল,—"বহ্নি তোমার পুর নামটাই আমার ভাল লাগে, তাই তোমায় আমি বহ্নিকুমারী বলেই ডাকবো। আজ এই রাত্রের অন্ধকারে আকাশের দিকে চেয়ে দেখ তো, চাঁদ নেই, কিন্তু নক্ষত্রগুচ্ছ বিচিত্র ফুলের মালার মত আকাশকে কেমন ঘিরে আছে ; ও আমার হৃদয় আকাশ ; আর ওই তোমার দেওয়া মালা। আজ আমি ওই নক্ষত্র মালাকে সাক্ষী করে বল্‌ছি ; আমাদের এ হাতে হাত রাখা শুধু আজকের নয় ; চির-দিনের, অনন্তকালের।" গবাক্ষপথে চেয়ে আছে বহ্নি নক্ষত্র খচিত আকাশের দিকে। তন্দ্রা এসেছে দেহমন ঘিরে। অন্ধকারের রূপের মাদকতায় বহ্নি বিহ্বল হয়ে পড়েছে ; নিস্তেজ দৃষ্টি শক্তি নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে ; বহ্নি নিদ্রিতা।

দেখতে দেখতে জ্যোৎস্না বন্যা সারা আকাশকে প্লাবিত করে দিল, বহ্নি এই জ্যোৎস্না সাগরে অবগাহন করে, জ্যোৎস্না ধৌত বসনে ঘাটে উঠে এলো ; জ্যোৎস্নার আলোয় মনোজের নিষ্কাম চোখে চোখ পড়তে চম্‌কে উঠলো বহ্নি ; মনোজকে সে আশা করেনি এখানে। কামদেবের আশ্রয় তো আলোর রাজ্যে নয়,

অন্ধকার যেখানে দিনের পর দিন জমাট বেঁধে আছে ; একটা ছিদ্র নেই যে সেখানে আলো প্রবেশ করে, নর্দ্দমার পচা দুর্গন্ধ সেখানে অহরহ নাকে এসে লাগে, ভট্ ভটে পাঁক যেখানে জমা হয়ে থাকে, সেই স্থানই তো কামের লীলা-নিকেতন। মনোজ তো সেখানের জীব ; আলোর রাজ্যে তার আনাগোনা কেন ? মনোজ কাছে এসেছে ; বহ্নি ঘৃণায় সরে দাঁড়াল ; মনোজ আরও কাছে এলো ; বহ্নির পা কাঁপছে ; এই কামদেবেরও তীব্র আকর্ষণ। বহ্নি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। স্বামীকে অবহেলা ; না – না অন্যায় হয়েছে বহ্নির ; সে কি তবে ক্ষমা চেয়ে নেবে ? না-তা হয় না।

নিশ্চল বহ্নি দাঁড়িয়ে রইল।

—বহ্নিকুমারী আমায় ক্ষমা কর! অনুশোচনার তীব্র কশাঘাতে আমার সমস্ত দেহ জ্বলে গেল ; বল—ক্ষমা করেছি। স্থির হয়ে থেকো না, আমার কথার উত্তর দাও।

—কে তুমি ?

—আমায় চিন্‌লে না; আমি মনোজ ; তোমার স্বামী।

—ওঃ কি চাও।

—তোমার আশ্রয় !

—কেন কামিনীর আশ্রয়ে কি অরুচি এলো ?

—ক্ষমা কর ; ও কথা বলে আর আমায় আঘাত ক'র না। প্রথম রজনীর কথা মনে পড়ে তোমার ; যেদিন প্রথম তোমার হাতে হাত রেখে বলেছিলাম,—"বহ্নি তোমার পুর নামটাই

আমার ভাল লাগে ; তাই তোমায় আমি বহ্নিকুমারী বলেই ডাকবো। আজ এই রাত্রের অন্ধকারে আকাশের দিকে চেয়ে দেখ তো ; চাঁদ নেই, কিন্তু নক্ষত্র গুচ্ছ বিচিত্র ফুলের মালার মত আকাশকে ঘিরে আছে। ও আমার হৃদয়াকাশ ; আর ওই তোমার দেওয়া…"

—থাক্ আর ও কথা উচ্চারণ করো না।

—কেন ? আমার ভালবাসা কি এতই ঠুন্‌কো।

—ভাললাগার মোহ বল, ভালবাসা নয় ; ভাললাগার মোহ নিজেকে সঙ্কুচিত করে, আর ভালবাসা নিজেকে ব্যাপ্ত করে দেয়। জানো তো, ঠাণ্ডা সব কিছুকে ছোট করে দেয় ; আর উত্তাপ প্রসারিত করে। ভাললাগার মোহ আর ভালবাসা এক কথা নয় ; বরং বিপরীত, এ মোহ নিজেকে ছোট করে তোলে, আর ভালবাসা নিজেকে বড় করে রাখে। তুমি তো আমায় ভালবাসনি, আমাকে তোমার ভাললেগেছিল ! তাই নয় ?

—হয়তো তাই। ভাল যদি বাসতাম, তোমায় দূরে ঠেলে দিতাম না।

—ভুল কথা, ভালবাসা শুধু কাছে টানে না দূরেও ঠেলে ; তবে এ দূরে ঠেলার মধ্যে পার্থক্য আছে যথেষ্ট।

—স্বীকার করি।

—স্বীকারই যদি কর, তবে ভালবাসার অভিনয় করে আবার কেন আমায় জ্বালাতে এলে ; বেশ তো ছিলাম। ক্ষণিকের সুখের চেয়ে এ চিরন্তন দুঃখ আমার ভাল লাগে ;

পথভোলা পথিককে বিদ্যুৎ যেমন একবার জ্বলে উঠে ক্ষণিক আলো দিয়ে আরও বিভ্রান্ত করে দেয়; এও তেমনি, ক্ষণিকের আনন্দ চিরন্তন দুঃখকে আরও গাঢ় করে তোলে।

—বহ্নিকুমারী পেছনের ইতিহাস ভুলে যাও। জীবনের পাতায় যে দু-একটা স্খলন এসেছে, তা কাটিয়ে উঠতে কি, তুমি আমায় সাহায্য করতে পার না? জীবনের একটা দিকের সঙ্গেই কি তোমাদের পরিচয় আর একটা দিকের সঙ্গে কি কোন যোগ নেই! কিন্তু ওই আর একটা দিকের ভাল মন্দ যে তোমাদের মজ্জার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

—বহ্নি নির্ব্বাক; পরীক্ষা তার এখনও শেষ হয়নি।

—চুপ করে থেকো না, আমার কথার জবাব দাও।

—জবাব দেওয়ার কি আছে; অভিনয় সত্যিই সুন্দর হচ্ছে; পুরুষের ভালবাসা।

হাসি পেল বহ্নির।

—নারীর ভালবাসাই যত মূল্যবান?

—কেন নয়? পুরুষের ভালবাসা বিলাসের একটা বিশেষ অঙ্গ; আর নারীর ভালবাসা নারীর জীবন। বিলাসের চিহ্ন নেই এখানে। তোমাদের হয়তো এর জন্যে সাধনা করতে হয়; কিন্তু আমাদের অনেক যাচাই করে তবে এ কিনতে হয়। যাচাই এ যদি ভুল হয়ে যায়; তবে চিরকাল লোকসান দিতে হবে। ভালবাসার বেচাকেনা হাটে যাচাই করে তাই মাল কেনা আমাদের স্বভাব। এখানে গলদ রাখা বিপদ।

—আমাকে যাচাই করা কি তোমার এখনও শেষ হ'ল না ; অবিশ্বাস কি এখনও তোমার মনকে আচ্ছন্ন করে আছে ?

—হ্যাঁ ; একবার গাছের গোড়াটা কেটে দিলে কি তাকে জল দিয়ে সহজে বাঁচান যায় ; হয়তো যায়, কিন্তু তার পেছনে চরম অধ্যাবসায় চাই আগে !···

·· বহ্নি, অনেক বেলা হয়ে গেছে, এবার উঠে পড়, শিখার জ্বরটা বড় বেড়েছে ; তার কাছে একটু বসো মা ; আমি একা আর পারি না।—সূর্য্যকান্ত বহ্নিকে ডাক্‌তে এসে এতগুলো কথা একটানা বলে গেলেন।

হঠাৎ স্বপ্ন ভাঙ্গে। শিখার অসুস্থতার খবর পেয়ে বহ্নি চম্‌কে উঠ্‌লো। নিদ্রা ভেঙ্গে মনে হল,—স্বপ্নের ইন্দ্রলোকে কামদেবের আসা যাওয়ার কথা। বহ্নি আফশোষ করে বললে, —ওগো আমায় ক্ষমা করো ; পূজারী হ'য়ে এলে, মন্দিরের দরজা আমি বন্ধ করে ছিলাম ; পূজো দেওয়া তোমার হ'ল না।

—মনোজও যদি এখন কিছু দিনের জন্যে এখানে আস্‌তো, অনেক খানা ভরসা পেতুম ; আমি একা কি করি, আর কি না করি কিছুই ভেবে পাচ্ছি না ; বুড়ো হয়েও যে আর কতদিন ঘানি টান্‌তে হবে জানি না।—সূর্য্যকান্ত আবার বলে চলেছেন।

বহ্নির নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল, কিন্তু আমেজ যায় নি ; তাও এখন কেটে গেল ; সূর্য্যকান্তের কথা শুনে আর শুয়ে থাকতে পারলো না সে ; এবার ধীরে ধীরে উঠে এসে বহ্নি শিখার ঘরে প্রবেশ করলো।

চৌদ্দ

বহ্নি ঘরে এসে শিখার গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠ্‌ল, বললে,—তোর গা যে একেবারে জ্বলে যাচ্ছে শিখা।

—শুধু গা!

—আর কি?

— কিছু না।

—মন তো?

—হয় তো। কোন নিশ্চয়তা নেই; কারণ প্রমাণ নেই। বিনা প্রমাণে কোন কিছু আশা করা ভুল; এ ভুল, হয়তো আদালতের বিচারকেরা বলবেন, কিন্তু যারা মনের বিচার করতে জানে তারা প্রমাণ না পেয়েও রায় দিয়ে দেবে।

—ডাক্তারও কি আদালতের বিচারক?

—হাঁ, ফৌজদারী আদালতের বিচারক নন বটে, তবে ডাক্তারীর আদালতে তাঁদের দিন রাত বিচার করতে হয়।

—এ বিচার কিন্তু প্রমাণ সাপেক্ষ!

—নিশ্চয় ডাক্তারের বিচারের সঙ্গে ফৌজদারী আদালতের বিচারকের বিচারের বিশেষ কিছু পার্থক্য নেই; কারণ ডাক্তারের সাক্ষী রক্ত মাংসে গড়া মানুষ নয়; বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত ষ্টেথস্‌কোপ।

—যাই বল দিদি, তোমার ওই ষ্টেথস্‌কোপের ক্ষমতা মনের অসুখ ধরার পক্ষে ঠিক কার্য্যকরী নয়।

—তা ঠিক, এখানে হার মানলুম।

—হারমানাই ভাল, এ নিয়ে আর তর্ক করতে আমি অক্ষম ; দেহের জ্বালা মনের জ্বালাকে ছাপিয়ে উঠেছে ; জ্বর কত জানি না ; কিন্তু জ্বালা যে বেশ তা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করছি।

—তোকে দেখে দুঃখ হয় শিখা।

হাসি পেল শিখার ; ঠোঁটের কোণে এক টুক্‌রো হাসিও ফুটে উঠল, চোখের কোণ দুটো আদ্র হয়ে এলো ; সামান্য কথায় বুকের ব্যথাটা যে এত টন টন করে উঠতে পারে, তা আজ মর্মে মর্মে অনুভব করল শিখা।

বহ্নি নির্ব্বাক হয়ে শিখার ভাবাবেগ লক্ষ্য করছিল।

বহ্নির দিকে তাকিয়ে দুর্ব্বল মনকে আবার সংযত করে নিল শিখা। হেসে বললে,—হাঁ, কি কথা হচ্ছিল, তর্ক করতে আমি অক্ষম ; সম্পূর্ণ ভুল। দেহ মনে আমার কোন জ্বালা নেই ; বেশ সুস্থ অনুভব করছি ; তর্ক করতে প্রস্তুত আমি ; মনের আবার জ্বালা কিসে ? জ্বর হয়েছে, সে তো এই দেহটাকে ঘিরে, দেহের সঙ্গে মনের কোনও সম্বন্ধই নেই ; সম্বন্ধই যদি থাকতো, তবে কি···না থাক্ !

—তবে কি বল ?

—না কিছু না।

—নিশ্চয় কিছু ; কি বল ?

—কথা দাও, দুঃখ করবে না।

—না।

—দেহের সঙ্গে মনের যদি সম্বন্ধ থাকতো, জামাই বাবু···

—আমার প্রতি অবিচার করতেন না, এই তো!

—হাঁ!

—কে বললে, তিনি অবিচার করেছেন? তবে শোন তোর ভুলটা ভেঙ্গে দি; আমার স্বামী আমার গর্বের বস্তু; তাঁকে পেয়ে আমি শুধু সুখী হয়েছি, তা নয়; ধন্য হয়েছি। এতদিন যে এখানে আসিনি তা থেকেও কি বুঝতে পারিসনি যে আমি সুখী!

শিখা চুপ করে গেল।

মনের দরজা নেই তাই; ভুল হয়েছে, দরজা আছে তা খোলার ক্ষমতা সকলের নেই; থাকতো যদি, বহ্নির মনের দরজা খুলে যে কেউ দেখতে পেতো;—শিখার আঘাতের শতগুণ আঘাত বহ্নির ক্ষত বিক্ষত মনে গিয়ে লেগেছে; মনের অন্দর মহলে বহ্নি হু হু করে কাঁদছে।

সূর্য্যকান্ত নির্ব্বাক বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন পেছনে; দু-বোনের কথায় একটু ছেদ পড়েছে দেখে, থার্‌মমিটার দিয়ে টেম্পারেচার দেখতে লাগলেন।

বহ্নি ধীরে ধীরে পাশের ঘরে উঠে গিয়ে; কি যেন লিখতে বস্‌ল তখনই।

প্রিয়তমেষু—

ওগো, তুমি এখন ভোগের চরম শীর্ষে ভোগের নেশায়

বিভোর হয়ে আছ ; আমি যেদিন চলে আসি সেদিনও ছিলে ; তবে ভোগের নেশায় নয়, মদের নেশায়। কর্ত্তব্য পরায়ণ পুরুষ তোমরা—নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ; কবে যে কাকে কি কথা দিয়েছিলে, তা নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাবার সময় নেই ; বিয়ের আগে আমাদের দেশের ভাঙ্গা মন্দিরের তলায় বসে আমার হাতে হাত রেখে যে কথা গুলো বলেছিলে,—তার একটা লাইন এখানে তুলে দিলুম, তোমাকে হয়তো বিব্রত করা হবে, তা হোক, এখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। —"আমাদের এ হাতে হাত রাখা শুধ্ আজকের নয়, চিরদিনের, অনন্ত কালের।" তোমার প্রতিশ্রুতির প্রতি শ্রদ্ধাই হয়েছে আমার জীবনের অভিশাপ। হায়রে, তুমিতো এখন তোমার রোস্থনারা বাইজির গান শুনছো,—

"আধো মুখ নীলাম্বর সোঁ ঢাকি
বিথুরী অলক কৈসি হৈ।
এক দিশা মানো মকর চাঁদনী
এক দিশা ঘন বিজুরী ঐসে হরি মন মো হৈ।"

তোমার রোস্থনারা বাইজির গান থামিয়ে আমার এ চিঠি দেওয়ার পেছনের ইতিহাসটা জান্‌তে চাও। এতে ক্ষতি হবে না তোমার, কর্ত্তব্য পরায়ণ পুরুষের অকলঙ্ক ইতিহাস অকলঙ্ক করেই রাখবে। বাপের বাড়ী বিবাহিত মেয়েদের জন্যে নয়, বিধবা কিম্বা কুমারীদের জন্যে ; আমিতো ও দুটোর কোনটার মধ্যেই নয় ; তবে এখানে কেন! তুমি বলবে আমি নিজেই এসেছি, হয়তো

তাই ; কিন্তু এ নিজে আসার পেছনে তোমার তাড়িয়ে দেওয়ার মনোভাব ছিল। তা থাক্ ও পুরাণো কাসন্দি আর আমি ঘাঁটতে চাই না। জানতো বাপের বাড়ী নিয়ন্ত্রিত হয়ে গৌরী যখন স্বামীর অবমাননা নিজে কানে শুনলো, তখন সে আর এক-মুহূর্ত্তও সেখানে থাকা সমীচিন বলে মনে করেনি। দেহত্যাগ করেছিল। আমরা তো গৌরীর মত সতী নই, যে স্বামীর অপবাদে দেহত্যাগ করবো। সতী কেন? বোকাও নই। আমরা আশাবাদী, সুখের বাসর শয্যার প্রলোভন এত তাড়াতাড়ী ত্যাগ করতে পারবো না। থাক্, তুমি এসো ; দ্বৈরথের প্রতিদ্বন্দী রথী হয়ে আসতে বলছি না তোমায় ; সাধারণ ভাবেই এসো ; একান্ত প্রয়োজন না হলে, বহ্নির আহ্বান তুমি পেতে না ; আমার জন্যে এ আহ্বান নয় ; আমার জীবন-দেবতার অপমানের তীব্র কষাঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে তোমাকে আহ্বান। এতদিন তোমায় আহ্বান জানাইনি, কারণ তার প্রয়োজন হয়নি, মেয়েদের যেখানে চরম দুর্ব্বলতা সেখানেই আজ ঘা খেয়েছি তাও বাবার কাছ থেকে নয় ; বয়সে ছোট, বুদ্ধিতে কাঁচা এমনই একজনের কাছ থেকে ; দিদি হই, শ্রদ্ধা করুক এটাই আমি একান্ত ভাবে চাই না ; তবে সম্মান রক্ষা করে চলুক এটা কে না চায়। আমার এতেই বড় দুঃখ হ'ল যে সেদিনের শিখার মনেও আজ আমার দৈন্যের মুখোস খুলে গেছে।

ওগো তুমি এসে আমায় নিয়ে যাও ; তোমার সম্মান রক্ষা

করে আমারও মান বাঁচাও। শিখার অসুখ ভাল থাকলে নিশ্চয় চলে যাব। অনুরোধ এড়িয়ে অপমানের বোঝা ভারী করে তুল না।…

—বহ্নি, এখনও কি লিখছ, ডাক্তার বাবু এসেছেন, তুমি একটু কাছে থাক, কি প্রয়োজন হয় দেখ, আমি নিচে গিয়ে চায়ের ব্যবস্থা দেখি।

—যাই বাবা!

চিঠি লেখা বন্ধ রেখে বহ্নি শিখার ঘরে উঠে এলো।

সামনের রাইটিং প্যাড্‌টায় প্রেসক্রিপসন লিখতে লিখতে ডাক্তারবাবু বল্‌লেন,—আপনার বাবাকে একবার আসতে বলুন, কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন।

—তিনি এখনই আস্‌ছেন। একটু অপেক্ষা করুন।

সূর্য্যকান্ত শীঘ্রই এসে পড়লেন, ডাক্তার বাবু তাঁকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন,— কিছু মনে করবেন না, শিখাদেবীকে কেন্দ্র করে কয়েকটা কথা আমার বলার আছে।

—নানা কিছু মনে করার নেই আপনি যা জানতে চান জিজ্ঞাসা করতে পারেন, আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই।

—না কিছু জানতে চাই না, জানা হয়ে গেছে, বলতে চাই।

—বলুন!

—শিখাদেবীকে কোন মনস্তত্ত্ববিদ্‌কে দিয়ে দেখালে পারতেন।

—কেন?

—কারণ তাঁর মনের অসুখ, দেহের অসুখটা তা থেকেই এসেছে ; মনের অসুখের কারণ কি ? জানতে পারলে বা তা দূর করার ব্যবস্থা করলে, দেহের অসুখ সেরে যাবে।

—কারণ তো ঠিক অনুমান করতে পারছি না।

—অনুমান করেও বেশী ফল হবে না ; যাক্, দেখা যাক্ দেহের অসুখের চিকিৎসা করে কতদূর কি করা যায় ; বিশেষ কোন ফল হবে বলে তো মনে হয় না।

—তবে উপায় কি ডাক্তার বাবু ?

—যদি দেখি দেহের অসুখ সত্যিই বেড়ে চলেছে, তখন না হয় মনস্তত্ত্ববিদের আশ্রয় নেওয়া যাবে !

—আপনি যা ভাল বোঝেন করুন।

সেদিন সামান্য জলযোগের পর ডাক্তারবাবু তাঁর অভয় বাণী বর্ষণ করে বিদায় নিলেন !

পনের

ক্ষণভঙ্গুর স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, কিন্তু কঠিন বাস্তবতায় ভাঙ্গনের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। প্রদীপের মনের আশা নিরাশার কল্পিত স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে বহুদিন, কিন্তু হায় দৈনন্দিন কর্ম জীবনে সে ভাঙ্গনের চিহ্ন ফুটে উঠেনি। বাইরের বাস্তব জীবনে ভাঙ্গনের চিহ্ন কিছু না থাকলেও, ভিতরের অবাস্তব হৃদয়ের ক্ষত বিক্ষত স্থানগুলো জ্বালা করে সর্ব্বদাই।

'প্রবাহে'র বহু সংখ্যাই আত্মপ্রকাশ করেছে নতুন নতুন রূপ নিয়ে, কিন্তু প্রকাশকের নিজের জীবনে নতুন কোন রূপান্তর পরিগ্রহ করতে পারছে না। কতগুলো দিন কেটে গেল; প্রদীপের কর্ম জীবনে দৈবচক্রেও কোনও আশার প্রদীপ জ্বলে উঠল না। এক ঘেয়ে জীবনের পরিসমাপ্তি কি দীপশিখা নিভে না গেলে আসবে না? প্রদীপ হতাশ হয়ে পড়েছে। তবুও কর্ত্তব্য তাকে সজাগ করে তুলছে; বল্‌ছে—জাগো, হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আবার নতুন সুরের রাগিণী বাজিয়ে তোল। যে তারগুলো ছিঁড়ে গেছে সেগুলোকে আবার শক্ত করে বাঁধ; সুরের মূর্চ্ছনায় সেতারার সুরধ্বনি জাগিয়ে তোল। কঠিন বাস্তব হাতছানি দিয়ে ডাক্‌বে, বার বার রক্ত পড়া যন্ত্রণাতুর হাতখানা দেখিয়ে বল্‌বে,—থামাও তোমার সুরের বিচিত্র মূর্চ্ছনা; দেখো হাত যে কেটে গেছে; রক্তে তর্জ্জনীর ডগা থেকে কনুই পর্য্যন্ত ভেসে যাচ্ছে। এখনও কি থামবে না? না! বাস্তবতার কঠিন হাতছানিতে সায় দেবে না তুমি। সুরের বিভিন্ন স্তরে পা দিয়ে এগিয়ে যাবে আরও উপরে; পাবে অনন্ত রসের সন্ধান। রক্তাক্ত হাতখানা বাদ দিতেও তুমি তখন কুণ্ঠিত হবে না। না আর নয়, চিন্তার সমুদ্র এবার পার হ'ল সে। শুরু করলো আবার 'প্রবাহে'র জন্যে লেখা ডাক্তারের প্রবন্ধ পাঠ করতে—ঈশ্বর, তোমার সৃষ্ট পৃথিবীতে এতো প্রভেদ কেন? মানুষ তো তোমার সৃষ্ট সমস্ত দানের অন্যতম, তবু তার মধ্যেও এতো পার্থক্য রেখেছ কেন? যে পৃথিবীর সুখ শান্তির, পৃথিবীর

সকল মাধুরিমার সন্ধান পেয়েছে তাকে দিয়েছ তোমার সকল অমৃত্বের সন্ধান; দিয়েছ প্রাকৃতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের চরমতম সফলতার সুযোগ। দুঃখ-দারিদ্রের কোল ঘেঁসেও তারা কোন-দিন গেল না,—চিরদিন সুখ স্বপ্নের ইন্দ্রলোকে চলে বেড়াতে লাগল! আর যারা দুঃখ পেল, তারা পেল স্বপ্ন ভাঙ্গার নিষ্ফলতা; দারিদ্রের নগ্ন-রাক্ষস তাদের হাঁ করে গিলতে এলো; বার বার আঘাত এসে তাদের কল্পনার বেদীমূল ভেঙ্গে দিয়ে গেল। মনটাকে আর সুসংবদ্ধভাবে বাঁধা গেল না; জীবনের তার ছিঁড়ে গেল, সুরের মূর্চ্ছনা ভেঙ্গে গেল; মনের বাইরে যে অবিচলিতের বেড়াজাল ছিল, তা ছিঁড়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। জড়তা এসে ঘিরে ধরল। সুখের বিন্দুমাত্র স্বাদ তারা পেল না।

এ কেন, কেন এমন হয়, তোমার সৃষ্ট পৃথিবীতে তোমারই সৃষ্ট জীবের মধ্যে এত প্রভেদ কেন?

—প্রদীপ বাবু আসতে পারি? বিজয় বাবু দরজার বাইরে থেকে অনুমতি চাইছেন।

—আসুন আসুন বিজয় বাবু; না আসতে পারার কি আছে। এই আপনার লেখাটাই আজ দেখছিলাম।

—কেমন দেখলেন? আসন গ্রহণ করে বিজয় বাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

—দেখলাম ঈশ্বরের উপর আক্রোশ কারুর কম নয়; মানুষ নিজের অবস্থা নিজেই সৃষ্টি করবে, আর প্রতি-মুহূর্ত্তের অসচ্ছলতার জন্যে ঈশ্বরের উপর দোষারোপ করবে। এ কেন?

—আমার লেখা কি মিথ্যের কাটগোড়ায় হাজির হয়েছে?

—আমি তো তা বলিনি! মিথ্যা কোথায়? খাঁটি বাস্তবতায় আপনার লেখা জীবন্ত। মানুষের জীবনে এমন কতকগুলো মুহূর্ত্ত আসে, যখন তার নিজের অবলম্বন বলতে কিছু থাকে না। আমরা তো এখনও সংস্কার মুক্ত হতে পারিনি, তাই যখনই নিজেদের নিঃস্ব একা বলে মনে করি; তখনই ঈশ্বরের আশ্রয়ে জায়গা খুঁজি; মনে মনে বলি,—"ঈশ্বর তুমি আমায় রক্ষে করো! ঘুষ যা চাও, দিতে রাজী আছি।" একেবারে যা পাবার কোন আশা নেই, তাও কামনা করে ঈশ্বরের কাছে চেয়ে বসি। অবাস্তব চাওয়া, বাস্তবতার চিহ্ন নেই যেখানে, তা পূর্ণতা লাভ করবে কোথা থেকে? যখনই চাওয়া পাওয়া হ'ল না, তখনই এলো বিদ্বেষ; বিদ্বেষ থেকে এলো আক্রোশ ঈশ্বরের কাছে আশ্রয় না পাওয়ার ক্রোধে, বার বার তাকে ছোট করে; তাকে নিচে নামিয়ে আমরা আমাদের মনুষ্যত্ত্বের অবমাননা করি। ধনী, দরিদ্রের পার্থক্য তো চিরকালই আছে বিজয় বাবু; পৃথিবীতে যে সুখ শান্তির স্বাদ পেয়েছে, সে পেয়েছে অনন্ত মাধুরিমার সন্ধান; আর যে দুঃখের অনলে জ্বলছে, সে পেয়েছে অবহেলা, লাঞ্ছনা, ঘৃণা। এতো নতুন কিছু নয়; জাতিভেদ আমি মানি না,—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মুচি, ডোম এতো সবাই একই জাতের অন্তর্ভূক্ত; মানুষ জাতের; কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে এই মানুষের মধ্যে দুটো জাত আছে; একটা ধনীর, আর একটা দরিদ্রের। এর জন্যে

দোষী কারা, আমি ধনীকেও দোষ দিই না, দরিদ্রকেও দোষ দিই না ; দোষ আমাদের প্রত্যেকের। জীবনের শুরু থেকে আমরা ধনী বা দরিদ্রের যে কোনও একটা গোষ্ঠিতে গিয়ে আশ্রয় নিই। এ কেন ? আমাদের কি নিজেদের একটা পারসন্যালইটি নেই ? ট্রাডিসন্‌কেই মেনে নেব ?

—সকলে তো আপনার মত চিন্তাশীল নয়, যে এতটা তলিয়ে দেখবে।

—এতটা কোথায়। অল্প একটু তলিয়ে দেখলেই তো বুঝতে পারবে, তারা কোথায় ? কি করে চলেছে ? তলিয়ে দেখার কথা ছেড়ে দিন ; আমি ওই চিন্তাশীল হওয়ার কথাই বলি , চিন্তা করতে শিখলেই তারা নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবে। তলিয়ে দেখার জন্যে তখন আর তাদের উপদেশ দিতে হবে না। যাক্ ও কথা ; প্রবন্ধের সবটা এখনও আমার পড়া হয়নি ; যতটুকু হয়েছে, তার শতগুণ বেশী আলোচনা হয়ে গেল ; বাকীটুকু পড়ে পরে আলোচনা করা যাবে ; হাঁ কাল সকালে তো আপনার আসার কথা ছিল ; কই এলেন না তো ? আমি সারা সকালটাই আপনার শুভাগমনের আশায় পথ চেয়ে রইলুম।

—আমায় ক্ষমা করুন প্রদীপ বাবু ; সব সময় নিজের ইচ্ছায় আমি চলতে পারি না, কত কথাই আজকাল রাখতে পারি না ; এজন্যে সত্যিই আমি লজ্জিত প্রদীপ বাবু ; ডাক্তারীর পসার এখন বেড়ে গেছে একটু ; এ না আসা তারই একটা দৃষ্টান্ত। গতকাল

ঠিক আপনার এখানেই আস্‌ব ; এমন সময় এক পুরাণ মক্কেলের বাড়ী ডাক পড়ল ; যেতে হল সেই হরিশ মুখার্জ্জী রোডে ; বাড়ী থেকে কি কম দূর !

—দূর বটে, কিন্তু সেত আমাদেরই আওতায়, ফেরার পথে ঘুরে গেলেই পারতেন।

—তা পারতাম, কিন্তু সেখানে বড় দেরী হয়ে গেল ; কেসটা বড় মজার প্রদীপ বাবু।

—কার কেস ?

—ওই যে বল্‌লাম হরিশ মুখার্জ্জী রোডে। ভদ্রলোকের তু' মেয়ে ; বড় মেয়ের অনেক দিন আগেই বিয়ে হয়ে গেছে ; তাঁর কথা বলছি না ; বলছি ছোট মেয়ের কথা ; মেয়েটির জ্বর ; বেশ ঘোরালই বলতে হবে, তবে জ্বরটা যে কি তা ঠিক বুঝতে পারলাম না , গৃহ-কর্ত্তাকে বলে এলাম, কোন মনস্তত্ত্ববিদ্‌কে দিয়ে দেখালে ভাল করতেন।

আজ আবার প্রদীপের মনে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। তা প্রকাশ করতে সে রাজী নয় ; মুখের বিকৃতভাবে তা প্রকাশ হয়েছে অনেকক্ষণ ; একটু লক্ষ্য করলে দেখা যেত কত পুঞ্জীভূত বেদনা, কত ব্যথা ভরা শঙ্কা প্রদীপের মুখে চোখে আজ ফুটে উঠেছে ; নির্ব্বিকার প্রদীপ হতবল হয়ে চেয়ে আছে ডাক্তারের দিকে।

ডাক্তার প্রদীপের অবস্থা দেখে ঠিক কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না।

প্রদীপ জিজ্ঞাসা করলে,—হরিশ মুখার্জ্জী রোডে কার বাড়ী ?

—সূর্য্য বাবুর।

প্রদীপ স্তম্ভিত হল, শিখার অসুখ! কি করবে সে; একটা কিছু কি করার উপায় তার নেই? ঈশ্বর একি করলেন। ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে প্রদীপ মনে মনে বললে,—আঘাতের পর আঘাত দিয়ে আমায় একি পরীক্ষায় ফেলেছ ঠাকুর। ডাক্তারের প্রবন্ধ মনে পড়ল প্রদীপের, নিজের সঙ্গে প্রবন্ধের মিল দেখে আরও আশ্চর্য্য ঠেকল তার। নিজেকে সে আর ঠিক নির্লিপ্ত করে রাখতে পারছে না; ইচ্ছে হচ্ছে বিজয় বাবুর কাছে সমস্ত জিজ্ঞাসা করে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে। অস্ফূট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও থেমে গেল প্রদীপ। না নিজের দুর্ব্বলতা এভাবে প্রকাশ করার কোন অর্থ হয় না। প্রকাশ না হয় সে করবে না; কিন্তু শিখার অবস্থা এমন হল কেন? সে সেদিন যে কথা বলেছিল, সে কথার মধ্যে এমন কি ছিল যা এতখানি আঘাত হানতে পারে। অন্তর্নিহিত মন সামান্য আঘাতে কি এতখানি ভেঙ্গে পড়তে পারে; শিখার অবস্থা কেমন? জীবন সংশয় হ'তে পারে নাকি? হয়তো পারে! প্রদীপ যে শিখাকে অনির্ব্বাণ রাখতে চায় না, সে শিখা জ্বলে থাকবে কি করে! আঘাত যত বড়ই হোক, তা যদি বাইরে থেকে আসে তবে তা এতখানি কঠিন হয় না। আর যদি প্রিয়জনের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে তা এসে উপস্থিত হয়; তবে তা বড় কঠিন হয়ে দেখা দেয়; সে আঘাতের সুতীব্র যন্ত্রণা সহ্য করা একান্ত কঠিন। কোমল মনের কথা বলি না, কঠিন হৃদয়ও তা সহ্য

করতে পারে না। প্রদীপ নিজেকে দোষী বলে মনে করল ; যে প্রশ্ন তার মনের কোণে বার বার উঁকি মারছিল, তা প্রকাশ করল এবার,—শিখা দেবীর-ই অসুখ নিশ্চয় ; তা মনস্তত্ত্ববিদের আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন কেন ?

—বিজয়বাবু বিস্মিত হলেন, নামের সঙ্গে প্রদীপবাবুর পরিচয় হল কোথা থেকে ! হায় বিজয়বাবু তো জানেন না যে শিখার সঙ্গে প্রদীপের শুধু নামের পরিচয় নয়, অন্তরের পরিচয় আছে। প্রদীপের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ; ওদের বাড়ীর সঙ্গে কি আপনি পরিচিত ?—এ প্রশ্নের পেছনে দুটো প্রশ্ন ছিল, একটা উপরের, আর একটা একান্ত তলার। প্রদীপও অত তলায় নামতে পারেনি তখন ; তাই উত্তর দিল তখনই,—হাঁ বিশেষভাবেই পরিচিত।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো প্রদীপের।

বিজয়বাবুর বুঝতে বেশী দেরী হল না এখন, শিখার এ সাংঘাতিক পরিণতির সূত্র কোথায়, মনস্তত্ত্ববিদের আশ্রয়ে যাওয়ার আর প্রয়োজন নেই ; শিখার অসুখের সূত্র এভাবে আবিষ্কৃত হওয়ায় তিনি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানালেন।

—কিছু যদি মনে না করেন ; তবে শিখাদেবী সম্বন্ধে কয়েকটা কথা আমি বলতে পারি !

—না না মনে করার কি আছে, আপনার যা বলার আপনি বলতে পারেন।

—শিখাদেবীর অসুখ শুনে আপনি বেশ শঙ্কিত হয়ে

পড়েছেন, অতটা শঙ্কা করার কোনও প্রয়োজন নেই, আমার এখন মনে হয়, তিনি শীঘ্রই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। হাঁ আপনি জিজ্ঞাসা করছিলেন আমি মনস্তত্ত্ববিদের আশ্রয় নিতে বলেছিলাম কেন ? কারণ, তাঁর দেহের অসুখের চেয়ে মনের অসুখ বড় সাংঘাতিক, দেহের যা অসুখ, তাতে এত দ্রুত এত ভেঙ্গে পড়ার কথা নয়। তাঁকে দেখে মনে হ'ল,—মনের কোনও অসুখে তিনি অনেকদিন আগেই ভেঙ্গে পড়েছেন, তারপর নিজের উপর অত্যাচার তিনি কম করেন নি। তাই তাঁর সামান্য দেহের অসুখ এতটা বিক্রীত হ'তে সুযোগ পেয়েছে।

—ওঃ ভাল হওয়ার আশা এখন আছে, তবে শঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, কি বলেন ?

—না! একটা কথা জিজ্ঞাসা করব প্রদীপ বাবু, যদি কিছু মনে না করেন!

—না মনে করার কিছু নেই, জিজ্ঞাসা করুন।

—আপনার সঙ্গে শিখাদেবীর কি কোন অবৈধ সম্বন্ধ ছিল ?

—আপনারা কাকে অবৈধ, আর কাকে বৈধ বলেন, তা আমি ঠিক জানি না ; যাক্ সে কথা, এ অবান্তর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কোনও অর্থ আছে কি ?

—না, তা নেই। তবে জানতে পারলে শিখাদেবীকে চিকিৎসার কিছুটা সুবিধে হতো, বাঁচানও হয়তো কঠিন হয়ে উঠ্তো না।

—এ উত্তরের উপর তার বাঁচা, না বাঁচাও কি কিছুটা নির্ভর করছে ? আশ্চর্য্য !

—আশ্চর্য্য হবেন না প্রদীপবাবু, আপনি আমার বন্ধু, শুধু বন্ধু নন্ আমার গুরু, আপনার জন্যেই আমার আত্ম প্রকাশের পথ এতটা সুগম হয়েছে, আপনি না থাকলে এ নতুনকে হয়তো কেউ আশ্রয় দিত না। আপনার কাছে আমি ঋণী, কৃতজ্ঞ; আমার দ্বারা আপনার ভাল না হোক কোন অনিষ্ট হবে না, এ আমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারি প্রদীপবাবু, আমায় আপনি বিশ্বাস করুন।

—ঋণী বা কৃতজ্ঞ হওয়ার কোনও কারণ নেই, আর গুরু হওয়ার যোগ্যতাই বা কোথায়? আমার অন্দর মহলের ইতিহাস যদি আপনার কাজে লাগে, আমার বল্‌তে কোনই আপত্তি নেই, বলছি,—হাঁ বিজয়বাবু, আমি শিখাদেবীকে ভালবাসতাম, সে ছিল আমার প্রেরণার উৎস, তাকে কেন্দ্র করেই আমার সাহিত্য-সাধনা পূর্ণাঙ্গ রূপ পেত। আমারা পরস্পর বিবাহের জন্যেও প্রস্তুত হয়ে পড়ি। সূর্য্যকান্তবাবুর কাছে, অনুমতি চাইতে গিয়ে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে আমাদের ফিরে আসতে হ'ল। শিখা তার বাবার অনুমতি না নিয়েই আমায় গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু একটা বিরাট বাধা তাতেও বাদ সেধেছে। মা মারা যাওয়ার সময় সে তার মার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল পিতার অমতে সে কোনদিনই কিছু করবে না। এ প্রতিজ্ঞাই হয়েছে আমাদের মিলনের পথে বাধা।

—সূর্য্যবাবুর অমত করার কারণ কি, বলতে পারেন?

—পারি; বল্ছি,—শিখার বোন, যাকে বিয়ে করেছিল, তাকে

ঠিক শিখার অবস্থায় এসেই। সূর্য্যবাবু সে বিয়েতে মত দিয়েছিলেন সাগ্রহে, কিন্তু বহ্নির স্বামীর পরিবর্ত্তন হয় যথেষ্ট, ভোগের চরম নেশায় তিনি বিভোর হয়ে থাকেন। বহ্নির দাম্পত্য জীবন মোটেই সুখের হয় না। বহ্নিকে সূর্য্যবাবু অত্যন্ত স্নেহ করতেন, কন্যার অবস্থা দেখে পিতার মনে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন আসে, তিনি প্রতিজ্ঞা করে বসেন,—এবার মেয়েদের নির্ব্বাচনে আর সায় দেবেন না, তিনিই পাত্র স্থির করে বিয়ে দেবেন।

বিজয়বাবু এবার স্তম্ভিত হলেন। বললেন,—তাঁর এই বিচিত্র খেয়ালের বসে তিনি একটা মেয়ের জীবন সংশয় করে তুলেছেন।

—তা ঠিক। সূর্য্যবাবু একটু বেশী উদ্ধত প্রকৃতির, কোন কিছু চিন্তা করে দেখার ক্ষমতা তাঁর নেই। একবার মনে হল মানুষের একটা স্বাভাবিক ধর্ম আছে, সে তার সমাজ ধর্ম। এখানে সে যথার্থ আশ্রয় পায় পরস্পরের যোগে, মানুষ পরস্পর সাহায্য করে বলে যে শক্তি পায়, এখানে তো সে শক্তির কথা খাটে না, সুযোগ সুবিধার সম্বন্ধও এখানে নেই, তবে কি? একবার মনে হল সমাজ ধর্মের কথাও এখানে খাটে না, অধীনের প্রতি নিজের জারিজুরী খাটিয়ে যে আত্ম-তৃপ্তি, সেই আত্ম-তৃপ্তির লোভেই সূর্য্যবাবু প্রলুব্ধ।

—আপনার কথা অসমর্থন করার কোন পথ নেই প্রদীপ বাবু, আমি সবই সমর্থন করি; কিন্তু এই নির্জ্জলা সমর্থন করার কোন অর্থ নেই আমার কাছে। যাক্ দেখা যাক্ নাড়ীর সঙ্গে

হৃদ্‌পিণ্ডের কোনও বিরোধ যাতে না ঘটে তার কি ব্যবস্থা করা যায়।

প্রদীপ ডাক্তারের মতামতে সায় দিয়ে সেদিনের মত আলাপ বন্ধ রাখল। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল তাই, ওদিকে আবার সূর্য্য তার খাড়াই রোদে পৃথিবীর রস সমস্তই শুষে নেবার চেষ্টা কর্‌ছিল। পৃথিবীর তাম্রদগ্ধ চেহারা পথিকের আতঙ্ক জাগাতে লাগল। সূর্য্য তখন প্রায় ষাট-ডিগ্রী অক্ষাংশে তার দুর্দ্দান্ত প্রতাপ নিয়ে নির্ভয়ে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, কমনীয়তার নমনীয় ঘোম্‌টা প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্যদেব সরিয়ে দিয়েছে, প্রকাশ হয়েছে,—পৃথিবীর বিশুষ্ক পিঙ্গল রুক্ষ মূর্ত্তি।

সূর্য্যকান্তের মত প্রকৃতির এই জ্বলন্ত নগ্নতা দেখে সেদিনের আলোচনা থামিয়ে দিতে প্রদীপ বাধ্য হ'য়েছিল। তাই বিজয় বাবুও বিদায় নিয়েছিলেন তখনই।

ষোল

বাস্তবতার কঠিন আঘাতে মানুষের সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় সত্যিই। কিন্তু আবার কখনও কখনও এ বাস্তব পৃথিবীতে মানুষের স্বপ্ন ফলে ফুলে পল্লবে পল্লবিত হয়ে, তার কামনার ধন সঙ্গে নিয়ে দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হয়। এ বিচিত্র পৃথিবীতে অসম্ভব, অবাস্তব কোন কিছুই নেই। জীবনের রঙ্গমঞ্চে মানুষের কল্পিত নাটক চাওয়ার পরিপূর্ণ দাবী মিটিয়ে মঞ্চস্থ হয় কতবার। স্বপ্ন ভাঙ্গার সঙ্গে স্বপ্ন সফল কত হল, তার হিসাব রাখা হয় না তাই, হিসাব যদি রাখা হত স্বপ্ন ভাঙ্গার দিকে সংখ্যা পড়ত অনেক বেশী। স্বপ্ন ভাঙ্গার সংখ্যা বেশী হলেও, স্বপ্ন সফলের সংখ্যাও কিছু কম নয়।

বহ্নির প্রথম জীবনের স্বপ্ন মনোজকে কেন্দ্র করে রূপ পরিগ্রহ করেছিল,—নানা বিচিত্রময় কল্পনার মধ্যে দিয়ে; মনোজকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলে মেনে নিয়ে বহ্নি মনের কল্পিত বেদীমূলে মনোজের দেবমূর্ত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল; প্রতিদিন বিচিত্র কুসুম অর্ঘে তার পূজো করে এসেছিল সে।

সে আজ বহুদিনের কথা বিবাহের পর মনোজের পাওয়ার তরণী পূর্ণতায় ভ'রে উঠে ছিল; তাইতো বহ্নিকে পাওয়ার সমস্ত রোমান্স তার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল; মনোজ উশৃঙ্খলতার চরম শীর্ষে আশ্রয় নিয়েছিল!

এতো গেল স্বপ্ন ভাঙ্গার কাহিনী; তারপর শুরু হল আবার

কল্পনার জালবোনা বহ্নির মনে। এ কল্পনাও রূপ পেল বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হয়ে।

চিঠি পেয়ে মনোজ ফিরে এসেছিল ; বহ্নির স্বপ্ন সাফল্যের গৌরব পেয়েছে এবার। মনোজের পরিবর্ত্তন হয়েছে যথেষ্ট। কামিনীর আশ্রয় ছেড়ে অনুশোচনার কশাঘাতে আপন বাস্তুভিটের সন্ধান পেয়েছে সে। বহ্নির কাছে দেহি-পদ-পল্লবের পালা শেষ করে শিখার শুশ্রূষায় সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

বহ্নিকে নিয়ে যাওয়া হয়নি মনোজের। স্ত্রীর মান-ভঞ্জন করতেই তার কেটে গিয়েছিল,—বেশ কয়েকটা দিন।

সূর্য্যকান্ত মনোজের সহযোগিতা পেয়ে বেশ খানিকটা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বৃদ্ধের অন্তরে যে অবলম্বী মন এতদিন দাঁনা বেঁধে উঠেছিল, তা বাস্তবে রূপান্তরিত হ'ল এবার। মনোজের সহৃদয় মনোভাবে সূর্য্যকান্তের বিরোধী মনের পরিবর্ত্তন হয়েছে যথেষ্ট।

বহ্নির কল্পনা রূপ পেয়েছে। আত্মসম্মান সে রক্ষা করতে পেরেছে ; এ এক সুন্দর প্রশান্তি তার সারা মনকে ভরিয়ে তুলেছে। কামনার বন্যা চাওয়ার দু-কুল ছাপিয়ে উপচে পড়ছে বহ্নির। তৃপ্তির তরণী পাল তুলে বহ্নির চাওয়ার প্লাবিত নদীতে এখন দুলে দুলে চলেছে। বহ্নির মনে কোন খেদ নেই ; স্বপ্ন সফলের আনন্দ উদ্বেলিত হৃদয় তার পূর্ণতার পরিপূর্ণ দ্যুতিতে ভরপুর।

সতের

মনের সঙ্গে দেহের যে একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে তা শিখাকে দেখলেই বেশ বোঝা যায়; চিকিৎসকের সুচিকিৎসা কেবল দেহকে কেন্দ্র করেই চলেছে, মনে তার কোন প্রতিবিম্বই পড়ছে না, তাই দেহ মনের কোনও পরিবর্ত্তন হয়নি শিখার, বরং দিনের পর দিন আপন মানসিক দুর্ব্বলতার চিহ্ন সারা দেহে প্রকাশ হয়ে পড়েছে,—একান্ত ক্ষীণ দুর্ব্বল শিখার মানসিক অসুস্থতা শারীরিক অসুস্থতায় রূপান্তরিত হয়েছে। আর অপর দিকে মানসিক দুর্ব্বলতার কোনও পরিবর্ত্তন হচ্ছে না!

মানসিক কি দৈহিক দুর্ব্বলতায় জানি না, আজ সকাল থেকে শিখা বিকৃত ভাষায় নানা প্রলাপ বকতে শুরু করেছে। আর দেহের তাপমাত্রাও বেশ মোটা অঙ্কতেই দাঁড়িয়ে আছে।

বহ্নি শিখার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে জিজ্ঞাসা করলে—শিখা অস্পষ্ট ভাষায় কি বলছিস? তোর কি হচ্ছে আমায় বল।

—প্রদীপদা বল্‌বে; আমি তোমাদের কিছু বলতে চাই না, ···প্রদীপদা কোথায় গেল? তাকে অপমান কোর না বাবা; তোমার পায় পড়ি।···

—শিখা কি যাতা বলছিস, তোর প্রদীপদা কোথায়? সে এখানে নেই তো। আর বাবা অপমান করবেন কেন?

—নেই, প্রদীপদা নেই; জানি তোমরা তাকে থাকতে

দেবে না। অপমান করলে সে কি থাকে ; থাকে না, থাকে না।···তাকে তোমরা থাকতে দিলে না কেন? কেন? সে তোমাদের কি ক্ষতি করেছিল ; তাকে দোষী করে তোমাদের লাভটা হল কি? ওরা শিল্পী ছোট বড় কথা কি ওদের বলতে আছে ; ওদের মনটা বড় নরম, সামান্য অপমান ওদের বড় বেশী বলে মনে হয় ; দেখলে না বাবা কি বলতেই সেই যে চলে গেল, আর এলো না, আবার কবে আসবে বলতে পার? হয়তো আসবে না ; পাতলা কাঁচের মত মন একটু আঘাতে একেবারে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো শিখার মুখ দিয়ে ; হতাশা তাকে ঘিরে ধরেছে, চারদিক থেকে। বহ্নি নির্ব্বাক অচেতন শিখাকে দেখে স্তম্ভিত হয়েছে। সূর্য্যকান্ত এখনও এ সব শোনেননি ; ছিঃ ছিঃ শিখার মুখ থেকে এ সব কথা সকলেই শুনবে তো। বাবার উপর রাগে ফুলতে লাগল বহ্নি! শিখা নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল ; বহ্নি আবার ধীরে ধীরে ডাকল—শিখা!

—কে প্রদীপদা? তুমি এসেছ, তুমি এসেছ? আমি জানতাম তুমি আসবে ; তোমার আত্মসম্মানের চেয়ে যে তুমি আমাকে বড় করে দেখেছ,—তাকি আর আমি জানি না।

—শিখা, কি বলছিস?

—ঠিকই বলছি গো, ঠিকই বলছি ; বাবার কথাগুলোই কি বড়, আর আমার ভালবাসা কি এতই ছোট, যে তুমি আসবে না। আমি জানতাম! তুমি আসবে!

আত্ম তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে শিখা ; বহ্নির হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে আপন চোখের উপর চেপে ধরেছে শিখা ; অবিশ্রান্ত ধারায় দু-চোখের জল উপ্‌চে পড়ছে শিখার, বহ্নির সারা হাত ভিজে উঠেছে।

শিখা চুপ করে গেছে এখন ; বহ্নি শিখার পাশেই বসে আছে ; নিষ্ঠুরের মত হাতখানা টেনে নেয়নি এখনও বহ্নি। শিখা তেমনি করেই সজোরে চেপে আছে হাতখানা। বুভুক্ষু কামনার সুতীব্র চাওয়া কিছুটা পূর্ণ হয়ে উঠছে শিখার রোমকুপের ছিদ্র দিয়ে বহ্নির পুরুষ হাতের সজীব স্পর্শে। কামনার বীজ শিখার সারা দেহে বোনা আছে ; তার অবচেতন মনে এতদিন পূর্ণ করার আকাঙ্খা জমা হয়েছিল, সামাজিকতার ভদ্র আবরণে তা ঢাকা পড়ে ছিল, আজ প্রকাশ পেয়েছে শিখার অজান্তে, তার স্মরণাতীত অবস্থার দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে। বহ্নির কর-পল্লব নিতান্ত কোমল পাপড়ীর মত, শিখা তারই স্পর্শে প্রদীপের কর-পল্লবের যৌণ স্পর্শ অনুভব করে চলেছে ; স্পর্শেন্দ্রিয় তার কাজ করে চলেছে ঠিকই ; কিন্তু অবচেতন অবস্থায়। কামেন্দ্রিয় আর স্পর্শেন্দ্রিয়ের সংযোগ আছে অভ্যন্তরে কিন্তু বহির্ভাগে তার প্রকাশ নেই !

মৃদু তালে পা ফেলে সময় এগিয়ে চল্‌ল ক্রমশই ; শিখা ঘুমিয়ে পড়েছে এখন ; বহ্নি আর ডাকলো না তাকে, পাছে তার এই ব্যথা ভরা নিদ্রা ভেঙ্গে গিয়ে আবার প্রলাপ শুরু হয়। চিন্তিতা বহ্নি ভয়ে কাঠ হয়ে বসে রইল তেমনি। কোন কথা

তার বলা হল না কাউকে; শিখার উপর রাগ করে সে চলে যেতে চেয়েছিল, এখন অনুশোচনা এসেছে তার—হায়রে বেচারী শিখা, মা নেই ওর সেই ছেলে বেলা থেকে; বহ্নি ওকে মানুষ করেছে কত যত্ন করে।

বহ্নির চিন্তা মোড় ঘুরে গেল। মনে মনে সূর্য্যকান্তকে উদ্দেশ্য করে বললে,—বাবা তুমি কি নিষ্ঠুর, শিখাকে দেখে কি তোমার এখনও চোখ খুলছে না; আশ্চর্য্য পুরুষ তোমরা; তোমরা কত নিষ্ঠুরই না হতে পার; সামান্য একটা কথা মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্যে কি একজনের জীবন বলি দিতেও তোমরা কুণ্ঠিত হও না, আশ্চর্য্য!

সূর্য্য কান্ত এসেছিলেন শিখার ঘরে, এসে দেখলেন শিখা নিদ্রিতা, বহ্নি পাশে বসে আছে; বহ্নির গাম্ভীর্য্য দেখে সূর্যকান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হলেন, বহ্নিকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—কি হয়েছে মা, শিখা এখন কেমন আছে?

—ডাক্তার বাবুকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর।

—কেন তুমি তো সকাল থেকেই ছিলে!

—ছিলাম।

—তবে বলতে পারছ না?

—না।

—কেন?

—কেন আবার;. আমি তো ডাক্তার নই যে দেহের চিকিৎসা করব।

—তার মানে।

—কিছু না।

—পরিষ্কার করে বল বহ্নি; আমার কাছে কিছু লুকিও না।

—লুকানোর কি আছে, চোখ থাকলেই তো দেখা যায়।

—কি দেখা যায় বহ্নি!

—চোখ থাকলেই দেখতে পেতে।

—কি বলছ মা?

—যা বলছি ঠিকই।

—আমায় ভেঙ্গে বল তুমি; বুড়ো বয়সে আমার সব ভুল হয়ে যাচ্ছে; ঠিক বুঝে কিছু করতে পারছি না মা।

—করার কি আছে। ডাক্তারকে দিয়ে যতই চিকিৎসা করান যাক্, কোন ফল হবে বলে আমার মনে হয় না। শিখার মনের অসুখ। ও যা চায় তাই করা উচিত।

—কি চায় ও?

—সকাল থেকে ওর জ্বরের ঘোরে অচেতন অবস্থার প্রলাপ শুনলেই বুঝতে পারতে।

—শিখা আজ প্রলাপ বকছিল?

—তা নয় তো কি।

—তুমি আমায় এতক্ষণ বলনি কেন?

—বলে কোন ফল হতো না, তাই বলিনি।

—তুমি ওর কাছে থাক, আমি ডাক্তারকে এখনই ফোন করছি।

—ডাক্তার বাবু এসেই বা কি করবেন, তাঁর কোনও হাত নেই।

—সে আমি বুঝব; তুমি যাও শিখার কাছে, বেশী উত্তেজিত হতে দিও না, আমি এখনই যাচ্ছি।

সূর্য্যকান্ত তখনই ফোন করার জন্যে নিচে নেমে গেলেন; বহ্নি বিমর্ষমুখে শিখার পাশে গিয়ে বসল।

শিখা তখনও নিদ্রিতা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বিজয়বাবু আবির্ভূত হলেন; সূর্য্যকান্ত তাঁকে সঙ্গে নিয়ে শিখার কাছে উপস্থিত হলেন। নিস্তেজ শিখা নিস্প্রভ হয়ে খাটের উপর পড়েছিল। বিজয়বাবু এসে পরীক্ষার জন্যে শিখার হাতখানা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই শিখা চমকে উঠল। প্রলাপ বকা সুরু হয়ে গেল তার। প্রদীপ প্রলাপের নায়ক; তাকে কেন্দ্র করে নায়িকার মান, অভিমান, অনুরোধ, উপরোধ। বিচিত্রভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা; পিতার রূঢ়তায় আক্ষেপ; সবই চলেছে।······

বিজয়বাবু ও সূর্য্যকান্ত শিখার প্রলাপ শুনে স্তম্ভিত হয়েছেন। বহ্নি সান্ত্বনার স্বরে কি কয়েকটা কথা শিখাকে বলছে, শিখাও মাঝে মাঝে তার উত্তর দিচ্ছে। আবার মাঝে মাঝে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠছে শিখা।

সূর্য্যকান্ত হতবল হয়ে শিখার দিকে তাকিয়ে আছেন, তিনি এতটা আশা করেননি। প্রদীপকে প্রত্যাখ্যান করার ফল যে এতদূর গড়াতে পারে তা কল্পনাও করতে পারেননি

তিনি। তিনি তো নিজের কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে প্রদীপকে প্রত্যাখ্যান করেননি; বহ্নিকে দেখে তিনি শিখার প্রতি সচেতন হয়ে পড়েছিলেন; শিখার ভবিষ্যৎ যাতে সুন্দর সফল হয় তারই দিকে তিনি লক্ষ্য দিয়েছিলেন। শিখা তাঁর মেয়ে, একজনের সর্ব্বনাশের পর আর একজন মেয়েকে তো দুঃখের অতল জলে ডুবিয়ে দেওয়া যায় না।

হঠাৎ ডাক্তারের আহ্বানে সূর্য্যকান্তের আত্মসমর্থন বন্ধ হয়ে যায়।

শিখার প্রলাপ তখনও চলে; বহ্নির সান্ত্বনাবাণী তখনও শোনা যায়।

রোগীর ঘর ছেড়ে পাশের ঘরে উপস্থিত হন দুজনে।

বিজয়বাবু বলেন,—প্রদীপবাবুকে এখনই না আনলে শিখাকে বাঁচান যাবে না; একটা কন্যা আপনাকে হারাতে হবে।

—ডাক্তার বাবু! ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছেন সূর্য্যকান্ত।

—হাঁ সূর্য্যবাবু দেহের যত রকম চিকিৎসা ছিল সবই আমি করেছি, এ চিকিৎসায় তাঁকে রক্ষা করা অসম্ভব। আমায় বিশ্বাস না হয়, যে কোনও বিশেষজ্ঞকে দিয়ে দেখাতে পারেন।

—আপনাকে অবিশ্বাস করব কোন অজুহাতে ডাক্তারবাবু।

—বিশ্বাসই যদি করেন; তবে এ বিশ্বাসের মর্য্যাদা দিয়ে আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করুন।

—প্রদীপবাবুকে আনার কথা বলছেন ?

—হ্যাঁ।

—তা কি করে হয় ডাক্তারবাবু; আমি যাকে বিদায় দিয়েছি, আমার নিজেরই জন্যে আবার তাকে ফিরিয়ে আন্‌ব ? এ অসম্ভব!

—তবে আপনি আত্মগর্ব নিয়েই থাকুন! আপনার মান প্রতিপত্তিই বড় হোক ; আর আপনারই জন্যে আপনার নিষ্পাপ কন্যার জীবন বলি যাক্ ; বাঃ সুন্দর। আপনি তো শিখার বাবা, আপনার মধ্যে তো একটা পিতৃহৃদয় আছে ; কন্যাকে নিজ হাতে করে হত্যা করতে আপনার হাত কাঁপছে না ?

—ডাক্তারবাবু!

—একজনকে হত্যা করার আপনার কোনও অধিকার নেই। আমি আনব প্রদীপবাবুকে ; দেখি আপনি কেমন করে আমায় বাধা দেন ;

—ডাক্তারবাবু!

সূর্য্যকান্ত দু-হাত দিয়ে আপন বুকে ডাক্তারকে চেপে ধরলেন ; বৃদ্ধের দু-চোখ অশ্রুপ্লুত হয়ে উঠল। ধরা গলায় বলে চললেন তিনি,—আমিও যাব আপনার সঙ্গে, প্রদীপের কাছে হাতে ধরে ক্ষমা চাইব ; বলব,—শিখা আমার মেয়ে নয় ; মেয়েকে কখনও বাবা নিজহাতে করে হত্যা করতে পারে ? কন্যার অভিষ্ট দেবতাকে কি কেউ পদাঘাতে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় ? একি ডাক্তারবাবু আপনিও কাঁদছেন!

—সূর্য্যবাবু আপনি স্থির হন। আপনার যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আমি প্রদীপবাবুকে চিনি, আমায় উপেক্ষা করার মত ক্ষমতা তাঁর নেই!

বিজয়বাবু বাহুমুক্ত হয়ে প্রদীপের খোঁজে রওনা হলেন তখন-ই।

বহ্নির সান্ত্বনা দেওয়া তখনও বন্ধ হয়নি।

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন; সূর্য্যকান্ত কিছুক্ষণ হতভম্বের মত সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন; পরে তাঁর জন্যে ডাক্তারের এত করার কৃতজ্ঞতায় নিচু হয়ে পড়লেন ডাক্তারের কাছে! একবার মনে হ'ল তাঁরও সঙ্গে যাওয়া উচিত। সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে নিচে নামছেন তিনি; কিন্তু পা তাঁর কাঁপছে। নামা হল না আর; মাঝপথে বসে পড়লেন সিঁড়ির একটা ধাপে!

মন তাঁর ভেঙ্গে গেছে; দেহ তাঁর ভেঙ্গে গেছে; আত্মপ্রত্যয় তাঁর নেই; নরম লতাগাছের মত তিনি ক্ষীণ দুর্ব্বল এখন। নিজে সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা তাঁর গেছে। অবলম্বন চাই একান্তই। শক্তি তাঁর লোপ পেয়েছে; শক্তিহীনের যষ্ঠি চাই। সূর্য্যকান্তের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ আজ কোথায়? তাঁর ভৈরবী দীপ্ত মূর্ত্তি এখন বিশুষ্ক ম্লান। আশ্রয়চ্যুত তিনি; ভীষণ ঘুর্ণিবাত্যায় তাঁর ঘরবাড়ী উড়ে গেছে। আশ্রয়চ্যুতি ঘটেছে; লাঠির ভরে পরের আশ্রয়ের জন্য এখন সূর্য্যকান্তের অবলম্বী মন কাতর হয়ে উঠেছে; দেহের সঙ্গে মনের সংযোগ না থাকলে সূর্য্যকান্তের এ অবস্থা হ'তো না।

আঠার

রাত্রির অন্ধকারে নিস্তব্ধ ঘরের নির্জন কোণে প্রদীপ এখনও জ্বলে রয়েছে, প্রদীপের দেহকে কেন্দ্র করে জ্বলন্ত শিখা আগুনের ফোয়ারার মত কেঁপে কেঁপে আকাশের দিকে উঠছে।

প্রদীপ একা, নিরালা ঘরের রাত্রির নিস্তব্ধতায় হতভাগ্য প্রদীপ, প্রদীপের শিখার দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে আছে; জ্বলন্ত শিখার দিকে তাকিয়ে তার নিজেকে মনে হচ্ছে; সে একটা পতঙ্গ; জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে মরাই তার কাজ! আগুনে না জ্বললে পতঙ্গ জীবনের পূর্ণতা আসবে না তার।

তাকিয়ে রয়েছে প্রদীপ।

শিখা বল্‌ছে,—আমার রূপের জ্বলন্ত সমুদ্রে ঝাপ দিয়ে তোমার জীবন পূর্ণ কর; এখনও দূরে দাঁড়িয়ে থেকো না। তোমার প্রেমের ইন্ধনে আমার রূপের শিখাকে আরও উজ্জ্বল করে দাও। এসো তোমাতে আমাতে মিলে, প্রেমিকে আর প্রেমাস্পদে মিলে সম্মিলিত মহিমায় বিশ্বকে একবার চম্‌কে দিই।

প্রদীপ শিখার কথাগুলো স্তব্ধ হয়ে শুনছে; রাত বেড়ে চলেছে ক্রমশই; শিখার চিন্তায় রাত্রির অন্ধকারে মাথার চুলগুলো তার এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। চোখ দুটো ফুলে ফুলে উঠেছে। জ্বলার কামনায় উন্মাদ প্রদীপকে প্রায় উন্মাদের মতই দেখাচ্ছে!

শিখার স্ফুলিঙ্গ নেই; লক্‌লকে জিহ্বা আছে, অম্বরের

আকর্ষণে উপরে উঠার ক্ষমতা আছে ; অম্বর যদি না থাকতো ! শিখার উপরে উঠা হতো না, এতো সাধারণ কথা সকলেরই বেলাই খাটে ; যাক প্রদীপ অবিচলিতের ব্যবধান ভেঙ্গে দিল এবার ; নিজেকে সে ঠিক করে ফেলেছে, শিখার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্যে।

প্রদীপ এখনও জ্বলে রয়েছে !

প্রদীপ গিয়ে দাঁড়াল শিখার কাছে ; হৃদয়ের স্পন্দনে স্পন্দনে অনুভব করল শিখার তীব্র আকর্ষণ। সজোরে চেপে ধরল আগুনের লেলিহান দীপ শিখা। অসহ্য যন্ত্রনা ; হোক যন্ত্রনা শিখার সঙ্গে তার ব্যবধান রক্ষা করা আর চলে না ; সে এখন শিখার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে এক করে দেবে।

প্রদীপের স্পর্শে অগ্নিশিখা বর্দ্ধিত তেজে জ্বলে উঠ্লো। জামার হাতা লেহি লেহি করে ভৈরবী ছন্দে নেচে উঠ্ল একবার। তবু প্রদীপ চিন্তা করে চলেছে ; শিখার সৌন্দর্য্যের ওই উৎসে ঝাপ দিয়ে সে ধন্য। প্রাণ-মাতানো রূপের ছটায় বিশ্বে আলোকের অপরূপ ছন্দলহরে সে মুগ্ধ।...

—প্রদীপ বাবু আসতে পারি ?

—কে ? অস্ফুট আর্ত্তনাদ বেরিয়ে এলো ; বিজয়বাবু ! এ অসময়। প্রদীপ আর দীপ-শিখার মিলন চলেছে, দেহে মনে এক হওয়ার সার্থক সজীব মিলন !

—প্রদীপ বাবু !

—কে ? বিজয়বাবু ?

সজোরে দরজায় ধাক্কা দেওয়ায় বন্ধ করা দরজা খুলে গেল।

—প্রদীপবাবু একি! বিজয়বাবু স্তম্ভিত। যাক্ নির্ব্বাক বিজয়বাবু ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রদীপের উপর।

অগ্নিশিখা তখনও দেহকে ঘিরে ধরেনি; দক্ষিণ হস্তের দু-ধারে আগুনের ছন্দ লহরী কেঁপে কেঁপে নেচে নেচে চলেছে।

সুপটু হাতের সুনিপুন কাজের তৎপরতায় প্রদীপ-শিখার মিলন বন্ধ হয়ে গেল। জ্বলে যাওয়া হাতের অসহ্য যন্ত্রনা প্রদীপ সহ্য করে হতবলের মত বিজয়বাবুর দিকে তাকিয়ে ছিল; দেহ মনের এই সুন্দর মিলনে বিজয়বাবুর হঠাৎ ধুমকেতুর মত আবির্ভাব কেন? শিখার সঙ্গে প্রদীপের বোধহয় সমস্ত মিলনই অবৈধ! অভিশপ্ত তারা, আধপোড়া হাতখানা মিলনের প্রথম স্পর্শের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে তার।

—প্রদীপবাবু এখনই যেতে হবে আপনাকে।

—কোথায়?

—আমি যেখানে নিয়ে যাব!

—কে আপনি?

—নিয়তি!

—তাই মনে হচ্ছিল; আপনি নিয়তির মতই অদ্ভুত।

—চলুন এখনই।

—এখনই?

—হ্যাঁ, সময় নেই।

—কোথায়, তা কি জানতে চাওয়া আমার পক্ষে খুব বেশী অন্যায় হবে ?

—অন্যায় মোটেই নয় ; ন্যায় হবে। জানাতে পারি ; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করতে হবে আপনাকে, আমার কাছে প্রতিশ্রুত হতে হবে, যে আমি যেখানের কথা বল্‌ব সেখানে যেতে দ্বিধা করা চলবে না আপনার।

—সে যাওয়া যদি দীপ-শিখার সঙ্গে মিলনের মত সার্থক হয়, তবে যাব। কথা দিচ্ছি !

—সূর্য্যকান্তের বাড়ী।

—অসম্ভব ; সেখানে অশুভ মিলনের দৃষ্টান্ত শুন্‌তে শুন্‌তে হাঁপিয়ে উঠ্‌ব।

—আমিও কথা দিচ্ছি অশুভ মিলনের দৃষ্টান্তের পরিবর্ত্তে শুভ মিলনের পথ সুগম হবে ; আগুনে জ্বলার দুঃসাধ্য মিলনের মত ও মিলন অত যন্ত্রনা দায়ক নয়।

মাটির দিকে তাকিয়ে কি কতক্ষণ ভেবে নিল প্রদীপ, তারপর হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠল,—না না সূর্য্যবাবুর সাংঘাতিক উপমার সামনে দাঁড়ান সত্যিই আমার পক্ষে অসম্ভব ; ও আমি পারব না। তাঁর যদি অনুশোচনা আসতো, তিনি যদি নিজের কন্যার অতল হৃদয়ের স্পর্শ পেতেন, তবে আমার যাওয়া শোভা পেত। দুটো জীবন যে ধ্বংস হচ্ছে তা আমি জানি ; কিন্তু তিনি জানেন না, তাঁর জানা আগে প্রয়োজন। আপনি

যান বিজয়বাবু ; শিখার বাবাকে আগে তাঁর কাজের সাংঘাতিক পরিণতির কথা জানান ; তারপর আমার কাছে আসবেন।

—তার পরেই আপনার কাছে এসেছি প্রদীপবাবু ; সূর্য্যবাবু অনুশোচনার তীব্র যন্ত্রনা আর সহ্য করতে পারছেন না, তাইতো আমার আসা। প্রদীপবাবু এত গেল সূর্য্যবাবুর কথা, আপনি কি তাঁর কন্যার কথা একবার চিন্তা করছেন ; শিখাদেবীর জীবনের আর কোন আশা নেই ; পঙ্গু তিনি, বিশীর্ণ দেহে প্রলাপের মধ্যে আপনার সন্ধান তাঁর অহরহ চলেছে। একটা নিষ্পাপ জীবন আজ এক সুতীব্র তৃষ্ণায় বলি হ'তে চলেছে ; শিখাদেবী এখন বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে একা যাত্রী ; সঙ্গী নেই, সহযাত্রী নেই, অবলম্বন নেই, তৃষ্ণার জল যা ছিল তা শুকিয়ে গেছে, উপযুক্ত একবিন্দু জল পাওয়ার কোন আশাও নেই ; মনের সঙ্গে দ্বন্দ করে তিনি হাঁপিয়ে উঠেছেন ; আর সহ্য করতে পারছেন না। আপনি চলুন প্রদীপবাবু, আপনার হাতে ধরে আমি বন্ধু অনুরোধ করছি, বার বার বলছি, শিখাদেবী যদি মারাও যান, তবে তাঁকে শান্তিতে মরতে দিন। মৃত্যুর পরেও যেন তাঁর তৃষিত হৃদয় তৃপ্ত হয় ; জলের সন্ধানে আর চাতকের দলে যেন আশ্রয় না নেন তিনি। চলুন প্রদীপবাবু।

—শিখা মৃত্যুশয্যায়! আমি যাব বিজয়বাবু ; আমায় নিয়ে চলুন—আপনি ; আপনি পথ প্রদর্শক ; আমি পথিক। আমার পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।

প্রদীপ ব্যাণ্ডেজ করা পোড়া হাতখানা বিজয়বাবু সাহায্যে

ভালকরে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে নিল। পরে অন্ধকার রাত্রির জমাট বাঁধা অন্ধকারে রাস্তার নেমে এলো, বিজয় বাবুকে সঙ্গে নিয়ে। গলির পরেই ছিল আলোর মালায় সাজান নগরী। প্রদীপ ও বিজয়বাবু সেই সাজান আলোর আলোয় পথ ভেঙ্গে ভেঙ্গে এগিয়ে চল্‌লেন।

প্রদীপ নীরব।

বিজয়বাবু ভেবে চলেছেন,—প্রদীপবাবুর আজ অভিসার নিশি; জীবন মৃত্যুর সংগ্রামে শিখার সঙ্গে শেষ মিলনের সুতীব্র আকাঙ্খায় প্রদীপের অভিসার। রাত্রির অন্ধকারে নিভে যাওয়া প্রদীপের জ্বলার আকাঙ্খায় শিখার আকর্ষণে প্রদীপের চলা! এ চলা সাংঘাতিক থামার জন্যে নয়; অনন্ত চলার উন্মাদনায়।

পথ ভাঙ্গা শেষ হল না এখনও। প্রদীপের অভিসার চলে; বিজয়বাবু নীরব!

উনিশ

সূর্য্য আপন তেজ বিকীর্ণ করে যেমন ধীরে ধীরে তাপমাত্র কমিয়ে আনছে, তেমনি সূর্য্যকে পরিবেষ্টনকরা পৃথিবী সুদূর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে এক পৃথক তুষার যুগের ভ্রুকুটি দেখতে পাচ্ছে। এত মিথ্যা নয়, তেজের ভাণ্ডার বাইরে থেকে পূর্ণ হওয়ার কোন ব্যবস্থা না থাকায় সূর্য্যের প্রাণ-সঞ্চারী তেজের সম্বল ক্রমশঃ নিঃশেষ হয়ে আসবে; আর তাকে ঘিরে

মহাশূন্যের যে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব, ধীরে ধীরে তাও সংকুচিত হয়ে যাবে। সূর্য্যের তেজ কমে যাওয়ার ফলে পৃথিবী যতই হিমাঙ্কের দিকে নামবে; ততই যাবে তার তাপ নিঃশেষ হয়ে; সূর্য্যে কিন্তু তাপ তখনও থাকবে প্রচুর; কিন্তু সূর্য্য থেকে পৃথিবী দূরে সরে যাওয়ায়, সে তাপের কিছুমাত্র অংশও পৃথিবী পাবে না। আর সমগ্র প্রাণী জগতের অবস্থা হবে, দেহ হ্রদের জলে নিমজ্জিত থাকা সত্বেও ট্যানটেলাসকে যেমন তৃষ্ণায় প্রাণ দিতে হয়েছিল তেমনি!

এতো গেল সূর্য্য আর পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পদার্থ-বিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা। এখানে আমাদের সূর্য্যকান্তেরও ওই একই অবস্থা; আপন শক্তি যা ব্যায়িত হয়েছে তা ফিরে পাবার কোন উপায় আর নেই! সূর্য্যকান্ত তখন জ্যোতিবিজ্ঞানের সূর্য্যের মত অত ধীরে ধীরে হিমাঙ্কের দিকে নামছেন না, অত্যন্ত দ্রুত নেমে এসেছেন, তাঁর বজ্র-গম্ভীর দীপ্ত মূর্ত্তি এখন কোথায়? ভেতরে তাঁর আগুন এখনও জ্বলছে, কিন্তু বাইরেটা আজ নির্ব্বাণোন্মুখ সূর্য্যের মত নির্ব্বাণের পথে নয়; নির্ব্বাপিত।

এত গেল সূর্য্যকান্তের কথা, সূর্য্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর অবস্থা যেমন, সূর্য্যকান্তকে কেন্দ্র করে তাঁর সামাজিক অবস্থা ঠিক তেমনি! সূর্য্যকান্তের বাইরেটা একেবারে ঠাণ্ডা হওয়ার ফলেই আজ প্রদীপের পুনঃপ্রবেশ সম্ভব হয়েছে।

প্রদীপ বিজয়বাবুকে সঙ্গে নিয়ে সূর্য্যকান্তের শান্ত মূর্ত্তির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন সামান্য তৃণকে

আশ্রয় করে বাঁচতে চায়, সূর্য্যকান্তও তেমনই বিজয়বাবুকে আশ্রয় করে, বাঁচার চেষ্টা করছেন। তৃণকে আশ্রয় করে নিমজ্জমান ব্যক্তির শেষ পরিনতি যেমন মৃত্যুই সম্ভব, এখানে কিন্তু তার বিপরীত; বিজয়বাবুকে কেন্দ্র করে সূর্য্যকান্তের আত্মরক্ষা সম্ভব হয়েছে।

প্রদীপ ফিরে এসেছিল; সূর্য্যকান্ত তাঁর পূর্ব্বের ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চাইতে গেলেন, প্রদীপ লজ্জায় অবনমিত হয়ে বলেছিল,—জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সামনে রেখেও যদি পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন না হওয়া যায়, তবে দৃষ্টান্তের কোন প্রয়োজন নেই এখানে।

সূর্য্যকান্ত উত্তর দিয়েছিলেন,—আমারই ভুল হয়েছিল প্রদীপ, এক্সেপ্সন্ কথাটা আমি ভুলে গিয়ে ছিলাম।

—এখনও ভুল করছেন, এটাই স্বাভাবিক; একসেপ্সন্ নয়। প্রদীপ জবাব দিয়েছিল।

সূর্য্যকান্ত কথার মোড় ঘুরিয়ে তখনই বলেছিলেন,—বহ্নির জীবনই একসেপ্সন্; প্রদীপ-শিখার নয়।

প্রদীপ উপরে উঠে গিয়েছিল, সূর্য্যকান্ত সেখানেই সিঁড়ির ধাপটায় বসেছিলেন,—অন্ধকার সেখানে জমাট বেঁধেছিল; সূর্য্যকান্তের উঠার ক্ষমতা নেই; আপন তেজ বিকীর্ণ করে তিনি হিমাঙ্কের শেষ ডিগ্রীতে নেমে এসেছিলেন, ভেতরে তাঁর তাপ থাকলেও তা বাইরে প্রকাশ পেল না। এ তাপ কমায় প্রদীপ-শিখার মিলন সম্ভব হয়েছিল; জ্যোতির্বিজ্ঞানের এসুদূর প্রসারিত

দৃষ্টি সূর্য্যকান্তের অনুশোচনার সুতীব্র যন্ত্রনা বেশ খানিকটা কমিয়ে এনেছিল।

খঞ্জ সূর্য্যকান্ত তেমনই বসেছিলেন; ডাক্তার বিজয়বাবু সূর্য্যকান্তকে নূতন প্রভাতের প্রভাতী সূর্য্যের আলো দেখাতে ডেকে নিয়ে গেলেন, যে আলো একটা গাঢ় আবরণ দিয়ে পৃথিবীর অন্ধকারকে ঢেকে রেখে দেয়! সেই নূতন সূর্য্যের আলো!

কুড়ি

নূতন প্রভাত! এখন বাইরে আলো, ভেতরেও আলো, অন্ধকারের কালিমা নেই কোথাও। সূর্য্য উঠেছে মুক্ত আকাশে, অন্ধকার কেটে গেছে, মেঘ যা ঢেকে রেখেছিল সূর্য্যকে তা সরে গেছে অনেকক্ষণ। নীল আকাশে আবার নীল পদ্মের দোলন সুরু হয়েছে; প্রভাতী সূর্য্যের আলো আবার ঝলমল করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রদীপের নিচেটায় যে অন্ধকার গুড়ি মেরে লুকিয়ে ছিল, সূর্য্যের আলো তারও খোঁজ পেয়েছে; গুড়ি মারা অন্ধকার, আলোর কাছে হেরে গিয়ে কোথায় যে আশ্রয় নিয়েছে, তার সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না। উন্মুক্ত দরজা, জানালা দিয়ে রবি-রশ্মি আজ সোজাই প্রদীপ শিখার মাঝখানে এসে উপস্থিত। এ আলোয় প্রদীপ-শিখা অভিষিক্ত।

আজ এ মুক্ত আলোয় প্রদীপ শিখাকে আশ্রয় করে জ্বলে

রয়েছে ; শিখা আজ দপ্ দপ্ করে জ্বল্ছে না ; নিভু নিভু আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে উঠছে না ; স্থির অচঞ্চলা সে, প্রদীপের আশ্রয়ে আপন সত্বার পরিচয় পেয়েছে শিখা। রাত্রির কয়েক ঘণ্টা মিলনে দেহ-মনের কলুষতা কেটে গেছে তার ; শিখাকে আজ সম্পূর্ণ সুস্থ দেখাচ্ছে। বিজয়বাবুর চিকিৎসা এতদিন যা কল্পনাও করতে পারেনি, গতকাল প্রদীপের আগমনে সেই কল্পনাতীত চাওয়া পাওয়ার পরিপূর্ণ দ্যুতিতে ভরপুর। মনস্তত্ত্ব-বিদের আশ্রয় থাকলে শিখার অসুস্থতা কেটে যেত বহুদিন আগে ! বিজয়বাবুর চিকিৎসার প্রয়োজন হ'তো না।

শিখা শুয়ে আছে খাটে, প্রদীপ তার কপালে, ভুরুর উপর ছড়ান চূর্ণ অলকগুচ্ছ বাম হাতে ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে বলছে,—সমস্যার মেঘ কেটে গেছে তো ?

—হ্যাঁ !

—মনের আকাশটা এখন পরিষ্কার ?

—অপরিষ্কার থাকবে কেন ? তুমি যে হেরে গেছ।

—'আমার হারটা তোমার জিতের এত কাছাকাছি যে সেটা জিতেরই সমান।'

—'তাহলে তুমি বল্তে চাও যে আমার জেতাটা তোমার হারের এত কাছাকাছি যে সেটা হারেরই সামিল ?'

—হ্যাঁ তাই !

—প্রদীপবাবু বাবা ডাকছেন, বঙ্কি এসে খবর দিল।

প্রদীপ সূর্য্যকান্তের ডাকে উঠে পড়ল তখনই। সূর্য্যকান্ত

দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজার বাইরে; প্রদীপকে আসতে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন তিনি—হার কারুরই হয়নি বাবা, জিত হয়েছে সবার!

প্রদীপ সূর্য্যকান্তকে প্রণাম করল; আশীর্ব্বাদ চেয়ে নিল।

সূর্য্যকান্ত বলে চল্‌লেন—আমার ভেতরের দরজা আজ খুলে গেছে; আমি আজ সূর্য্যকান্ত নই; অয়সকান্ত। নক্ষত্র খচিত আকাশে ধ্রুবতারা নই, জোনাকির দলে হয়ে অন্ধকারে আলো জ্বালাবার ব্যর্থ প্রয়াস করি। আমি পাল্‌টে গেছি; তুমি আমায় পাল্‌টে দিয়েছ; কর্ম্মকার যেমন বাঁকা লোহাকে আগুনে পুড়িয়ে পিটে পিটে সোজা করে দেয়, ঠিক তেমনি। আশীর্ব্বাদ আমি প্রাণ ভরেই করছি। শিখাকে তুমি অনির্ব্বাণ রাখ প্রদীপ; আজ আমি হেরে গেছি; জিতেছ তোমরা, জিতেছেন বিজয়বাবু।

ডাক্তারের আনন্দে ভাষা মূক হয়ে গেছে। সূর্য্যকান্তের কথা কান পেতে শুনছে শিখা!

সূর্য্যের তেজ আবার প্রখর হয়ে উঠেছে; সূর্য্যকান্তের সঙ্গে এখন আর এর তুলনা হয় না।

শেষ

—শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে—

শ্রীশান্তিময় ঘোষালের

আধুনিক কাব্যগ্রন্থ

ও

নির্ভীক সমাজ সেবীর আত্ম-দানের

কাহিনী

(কিশোর উপন্যাস)

এই লেখকের লেখা

"পাথেয়"

—বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার মতামত—

আনন্দবাজার পত্রিকা—"পাথেয়" লেখকের প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসটির গঠন ভঙ্গী প্রশংসনীয়। লেখকের ভাষা সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ।......উপন্যাসটির মধ্যে লেখকের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

সঙ্ঘবাণী (বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ)—পুস্তকখানি লেখকের প্রথম রচনা হিসাবে সার্থক হইয়াছে। ভাষা সুন্দর ও স্বচ্ছ। ...বর্ণনা-ভঙ্গী ও রচনা চাতুর্য্যের পরিচয় আছে। লেখকের সাহিত্যিক উন্নতি কামনা করি।

মহিলা—"পাথেয়" একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। প্রণয় ও অনিমার জীবন দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে 'পাথেয়' এগিয়ে চলেছে আঘাত ও সংঘাতের আবর্ত্তে পূর্ণতার পথে। উপন্যাসের ভাষা সাবলীল। ...নূতনত্বের আভাষ আছে।

বসুমতী—প্রণয়ের সঙ্গে অনিমার সঙ্গীত শিক্ষকরূপেই প্রথম পরিচয়। অতঃপর পরস্পর পরস্পরকে আরও নিকটে পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে কিন্তু বিধি বাদ সাধিল। পিতার আদেশে প্রণয় অন্যত্র বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেও দাম্পত্য জীবন সুখের হইল না।......লেখকের ভাষা ও বাচন-ভঙ্গী প্রশংসনীয়।—ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

দাম—এক টাকা বারো আনা

কেতাব-ভবন, ৫, সানইয়াৎ সেন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—১২